দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা,
১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী বৈদ্যুতিক-মেসিন-যন্ত্রে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত

ভূমিকা

দেশবন্ধুর সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা প্রকাশিত হইল। ইহাকে ঠিক জীবন কথা বলা যায় না। লোকের জীবিতকালে তাঁহার জীবন-নাটকের সক অঙ্কের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ আলোচনা করার অনেক অন্তরায় আছে; বিশেষতঃ দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় দেশবন্ধুর জীবনের সকল কথা অল্প সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করাও স্বল্পায়াসসাধ্য নহে। সুতরাং এই সংক্ষিপ্ত রচনা পূর্ণাবয়ব ও ক্রটিবিচ্যুতিশূন্য বলিয়া আশা করা সঙ্গত নহে। তবে ভরসার মধ্যে এই যে, ইহাতে যাঁহার জীবন-কথা আলোচিত হইয়াছে, বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর গৌরব সেই পুরুষসিংহের পুণ্য-পবিত্র নাম-মাহাত্ম্যে এ রচনা সাফল্য-গৌরবে মণ্ডিত হইবার স্পর্দ্ধা রাখিতে পারে, রচনাকারও সে নাম কীর্ত্তন করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিবার আশা পোষণ করিতে পারে। দেশবন্ধুর গুণমুগ্ধ সহৃদয় বাঙ্গালী পাঠক এই কথা-গুলি স্মরণ করিয়া গ্রন্থ পাঠ করিবেন, ইহাই নিবেদন। ইতি

২০শে মাঘ, ১৩২৮ সাল,
কলিকাতা।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

উপক্রমণিকা

সে কোন্ দেশ—যে দেশে স্মরণাতীত যুগের প্রথম প্রভাতে সত্য ও জ্ঞানের সন্ধানে মানুষ আকুলি-বিকুলি করিয়াছিল? সে কোন্ দেশ—যে দেশের মানুষ পৃথিবীর বিলাস-লালসা হেলায় জয় করিয়া ত্যাগের মহিমা—সত্যের মহিমা প্রচার করিয়াছিল? সে কোন্ দেশ—যে দেশে জীবে দয়ার মহাবাণী প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল,—মানুষ মানুষের জন্য, পশু-পক্ষী-কীটপতঙ্গের জন্য, আর্ত্তপীড়িত-শরণাগত-দীনের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিল? সে কোন্ দেশ—যে দেশে মানুষ ভাবের প্রেরণায় এই লোভমোহের আগার মায়ার সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিল?

সে যে আমার এই সাগর-চুম্বিত-চরণা শৈলকিরীটিনী পুণ্যভূমি জননী জন্মভূমি! এই আমার রত্নপ্রসবিনী স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির আকাশে, বাতাসে, জলে, অনলে, কাননে, কান্তারে সেই ভাব যে জড়ান মাখান! দধীচি, শিবি, হরিশ্চন্দ্র, নল, আরুণি, একলব্য, বলি, কর্ণ, ভীষ্ম, অর্জ্জুন—কোথায় কোন্ দেশে ত্যাগের এমন জলন্ত নিদর্শন খুঁজিয়া পাইব? কোথায় কোন্ দেশে সীতা, সাবিত্রী, শৈব্যা, দময়ন্তী জাতির জীবন-পটে ফুটিয়া উঠে,—ফুটিয়া জগৎ জুড়ায়?

সে এই দেশ—যে দেশের জল-মাটীতে রাম-লক্ষ্মণ জন্মলাভ করিয়াছিলেন—একটা ভাবের প্রেরণায়—সত্যের জয়, সত্যের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে রাজ্যৈশ্বর্য্য তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন, দুঃখ-বিপদকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। সে এই দেশ—যে দেশে বুদ্ধ,চৈতন্য একটা ভাবের প্রেরণায় জীবের দুঃখকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যের পথে প্রয়াণ করিয়াছিলেন, জীবের দুঃখমোচনে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন।

এই মাটীতে, এই জলে, এই বাতাসে, এই আকাশে এই ভাবের প্রেরণা, এই ত্যাগ, এই সন্ন্যাস, এই আপনা ভুলিয়া পরসেবা সম্ভব। তাই আজ দেশরঞ্জন চিত্তরঞ্জনের উদ্ভব। গোড়ার কথাটা না বুঝিলে শেষটা বুঝা যাইবে না, তাই এত কথা বলিতে হইল।

বলদর্পিত অথবা সাম্রাজ্যমদ-গর্ব্বিত প্রতীচ্য যে Superman বা অতি-মানুষের কল্পনা করে, তাহার সহিত এ মানুষের কোনও সম্পর্ক নাই। কার্লাইল যে Heroর কথা বলিয়াছেন, এমার্সন যে Representative men এর কথা বলিয়াছেন, তাহার সহিত এ মানুষের সৌসাদৃশ্য নাই; এ মানুষ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মানুষ, এ মানুষের বৈশিষ্ট্য তাহার ভারতীয়ত্ব, এ মানুষের জীবনের ধারা যে খাতে প্রবাহিত হয়, সে খাতের বৈশিষ্ট্য ভারতীয়ত্ব। ভারতীয়ের অস্থিমজ্জায় এ মানুষের ভাব ও চিন্তার ধারা ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। যে বৈরাগ্য, ত্যাগ বা সন্ন্যাসের মধ্য দিয়া এই বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠে, তাহা হইতে প্রতীচ্যের Renunciation অনেক পৃথক্।

চারিশতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য এক ভাবের বন্যায় বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীকে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। সে দিন বাঙ্গালার এক নিভৃত পল্লীতে মৃদঙ্গ-করতাল-ধ্বনির সহিত যে হরি-নাম উঠিয়াছিল, তাহা অজয়ের তট হইতে মণিপুরের বনান্তরাল পর্য্যন্ত ভাসাইয়া দিয়াছিল। আর আজ আর এক ভাবের বন্যায় দেশরঞ্জন চিত্তরঞ্জন সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে

ভাসাইয়াছেন—বাঙ্গালী আজ চিত্তরঞ্জনের বিরাট ত্যাগের মূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তি-শ্রদ্ধাপ্রীতিসম্ভ্রমের ভারে নতমস্তকে অঞ্জলি ভরিয়া অর্ঘ্য দিতেছে, বলিতেছে,—

"এস বাঙ্গালীর হৃদয়রঞ্জন চিত্তরঞ্জন! এস দেশবন্ধু! দেশের এই ঘোর অমানিশার অন্ধকারে তোমার বিরাট ত্যাগের জ্বলন্ত বর্ত্তিকালোক লইয়া বাঙ্গালাকে পথ দেখাইয়া চল। হে বাঙ্গালীর আশা, বাঙ্গালীর ভরসা, বাঙ্গালীর বিরাট পুরুষ! তোমার ভাব-প্রবাহের পুণ্য-ধারায় স্নাত-প্লাবিত হইয়া বাঙ্গালী ত্যাগের পথে, মুক্তির পথে অগ্রসর হউক। বাঙ্গালী দেশ ভুলিয়াছে, ঘর ছাড়িয়াছে, পদে পদে পরকে জড়াইয়া ধরিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, পরকে আশ্রয় বলিয়া মানিতে শিখিয়াছে। এস দেশবন্ধু! বাঙ্গালীর এ মোহ ঘুচাও, তোমার ত্যাগের পুণ্যস্পর্শে বাঙ্গালীর পর-নির্ভরতা দূর কর, বাঙ্গালীকে মানুষ হইতে শিখাও। তুমিই বলিয়াছ:—"আমার নিজের ঘরেই যদি আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া চলিতে না পারি, নিজের দেশেই যদি পশুর মত হইয়া থাকিতে হয়, তবে আমার মান, আমার ধর্ম্ম থাকিল কই?" তবে শিখাও বাঙ্গালীকে মানুষ হইতে, তাহারা ত মেষ নহে।

জাতির বড় ভাগ্যে এমন জন-নায়ক মিলিয়া থাকে। কোন্ পুণ্য-ক্ষণে চিত্তরঞ্জন জাতির চিত্তরঞ্জন করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছেন, তাহা সেই সকল পুণ্যের আকর ভিন্ন কে বলিতে পারে? কত কত যুগ ধরিয়া দেশ ও জাতি এমন পুণ্যক্ষণের প্রতীক্ষা করিতেছিল, সে সুযোগ আজ সমুপস্থিত। এ সুযোগ একদিন আসিবে, সে আশা দুরাশা ছিল না। এ যে সেই দেশ—যে দেশে

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বন-ভবনে
জ্ঞান, ধর্ম্ম কত পুণ্য কাহিনী।

এ যে আমার বহুবলধারিণী রিপুদলবারিণী দেশমাতৃকা—বাহুতে শক্তি, হৃদয়ে ভক্তি, তুমি মা!

তুমি ত মা সেই, তুমি ত মা সেই
চিরগরীয়সী ধন্যা অয়ি মা!
আমরা শুধুই হয়েছি মা হীন,
হারায়েছি সব বিভব-গরিমা!

চিরসূর্য্যকরোজ্জ্বলা ভুবন-মনোমোহিনী মা আমার! সে মায়ের যোগ্য সন্তান হইবার স্পর্দ্ধা হারাইয়াছি বলিয়াই কি এক শুভ পুণ্যক্ষণে সে স্পর্দ্ধা জাগাইবার জন্য চিত্তরঞ্জনের আবির্ভাব? চিত্তরঞ্জন যে বাণী লইয়া বাঙ্গালীর রুদ্ধ হৃদয়কপাটের বক্ষপঞ্জরে আঘাত করিতেছেন, সে বাণী বাঙ্গালী শুনিবে—আজ না হয় দুই দিন পরে শুনিবে। সে বাণী কি? এস ঘরে ফিরে এস—আত্মস্থ হও, আপনাকে আপনি চিন—হৃদয়ে তোমার দুর্জ্জয় শক্তি সুপ্ত রহিয়াছে—জাগাও তাহাকে—আপনা হইতেই আপনার শক্তির উৎস উৎসারিত কর—এই চিত্তরঞ্জনের মুক্তি-মন্ত্র।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতিরূপে চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন :—

"আমরা আহারে, ব্যবহারে, আচারে, বিচারে, ভাষায়, ভাবে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, সমস্ত জীবনক্ষেত্রে, প্রতি পাদবিক্ষেপে বিলাতের অনুকরণ করিয়াছি। মন্দিরের বদলে সভা করিয়াছি, সদাব্রতের বদলে হোটেল করিয়াছি, থিয়েটার করিয়া আনন্দের মূল্যে দুর্ভিক্ষে দান করি, লটারী করিয়া অনাথ-আশ্রমের চাঁদা তুলি, দেশে যত রকমের স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার সহজ উপায় ছিল, তাহার বদলে বিলাতী খেলা আমদানী করিয়াছি। অর্থোপার্জ্জন যে আমাদের প্রকৃত জীবন-যাপনের উপায় মাত্র, তাহা ভুলিয়া গিয়া বিলাতী Industrialism এর নকল করিয়া অর্থ উপার্জ্জনের জন্যই জীবন যাপন করিবার চেষ্টা করিতেছি।"

এই যে 'বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া স্বদেশের কুকুর-পূজা' করিবার

প্রবৃত্তি—এই যে 'আমার দেশ' বলিয়া গর্ব্বানুভবের আকুল আকাঙ্ক্ষা, ইহাই ধনী বিলাসী চিত্তরঞ্জনকে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর সাজে সাজাইয়াছে —ত্যাগ-মন্ত্রের দীক্ষাগুরু যুগাবতার সত্যসন্ধ মহাত্মা গন্ধীর ভক্ত অনুরক্ত শিষ্যে পরিণত করিয়াছে। তোমার দেশ ও আমার দেশ বলিতে যাহারা বুঝায়, তাহারা আমার আপনার হইতেও আপনার, 'বাঙ্গালার মাটী, বাঙ্গালার জল ধন্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান্,'—এই যে আকুল প্রার্থনা, ইহাই চিত্তরঞ্জনের মহাত্যাগের মেরুদণ্ড। তাই চিত্তরঞ্জন বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছিলেন :—

"যাহারা বর্ত্তমান বাঙ্গালার চারিকোটি ষাট লক্ষের চারি কোটি, যাহারা দেশের সার বস্তু, যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া মাটী কর্ষণ করিয়া আমাদের জন্য শস্য উৎপাদন করে, যাহারা ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যেও মরিতে মরিতে বাঙ্গালার নিজের সভ্যতা ও সাধনাকে জাগাইয়া রাখিয়াছে, যাহারা আজিও শুদ্ধচিত্তে সরল প্রাণে মর্ম্মে মর্ম্মে বাঙ্গালার মন্দিরে মন্দিরে পূজা দেয়, মসজীদে মসজীদে প্রার্থনা করে, যাহাদের জন্য বাঙ্গালী আজিও বাঙ্গালী,যাহারা বাঙ্গালার মাটী ও বাঙ্গালার জলের সঙ্গে এক হইয়া বাঙ্গালী জাতির জাতিত্বকে,জ্ঞানে কি অজ্ঞানে সাগ্নিকের অগ্নির মত জ্বালাইয়া রাখিয়াছে,যাহাদের আমরা বিলাতী শিক্ষার মোহে আইন-আদালতের প্রভাবে, জমীদারের খাজানা ন্যায্যভাবে কি অন্যায় করিয়া বাড়াইবার জন্য শত প্রলোভন দেখাইয়া, শত অত্যাচার করিয়াও একেবারে নষ্ট করিতে পারি নাই, যাহারা বাস্তবিকই বাঙ্গালা দেশের একাধারে রক্ত মাংস প্রাণ, তাহারা বড় কি আমরা বড় ? কোন্ সাহসে কিসের অহঙ্কারে তাহাদের জলস্পর্শ করি না, কাছে আসিলে ঘৃণিত কুক্কুরের মত তাড়াইয়া দিই ? এত অহঙ্কার কিসের ? সাবধান! ওঠ! জাগ! ঐ যে বাঙ্গালার কৃষক সমস্ত দিন বাঙ্গালার মাঠে মাঠে আপনার কাজ ও আমাদের কাজ শেষ করিয়া—দিবাবসানে ঘর্ম্মাক্ত

কলেবরে বাঙ্গালার কুটীরে কুটীরে বাঙ্গালার গান গাহিতে গাহিতে ফিরিতেছে, উহারা মুসলমান হউক, শূদ্র হউক, চণ্ডাল হউক, উহারা প্রত্যেকেই যে সাক্ষাৎ নারায়ণ! অহঙ্কারী, মাথা নত কর, ডাক, ডাক, সবাইকে ডাক—প্রাণের ডাক শুনিলে কেহ কি না আসিয়া থাকিতে পারে?"

এই ত চিত্তরঞ্জনের চিত্তের বাণী :—

আপনার মায়ে মা ব'লে ডাকিলে,
আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে,
সব পাপ-তাপ দূরে যায় চ'লে,
পুণ্য প্রেমের বাতাসে।

এ ভাবের ভাবুক না হইলে চিত্তরঞ্জনকে বুঝা যায় না। এ রসে মগ্ন না হইলে চিত্তরঞ্জনের ভাবুকতার রসাস্বাদ করা যায় না। যাঁহারা মহা বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলেন, "আস্ত পাগল! পাগল না হইলে এ খেয়াল হয়—সব ছাড়িয়া হুজুগে মাতে?" তাঁহাদের বলি, জগতে যত কিছু "কাজ" হইয়াছে, সব এই 'ভাবের' পাগলের দ্বারা। চৈতন্য পাগল, বুদ্ধ পাগল, নানক পাগল, মহম্মদ পাগল, খৃষ্ট পাগল, রামকৃষ্ণ পাগল—সব পাগলের দল। কিন্তু জগতের দুর্ভাগ্য, এমন পাগল ক্বচিৎ কখন দেখা দেয়, ধরা দেয়। ধর্ম্মের দিক্ হইতে যেমন এই সব পাগলের মেলা, তেমনই ঐহিক সাধনার দিক্ হইতেও এমনই রাণা প্রতাপ পাগল, চাঁদবিবি পাগল, সীতারাম পাগল, প্রতাপাদিত্য পাগল, পিম হ্যামডেন পাগল, গ্যারিবল্ডি পাগল, ওয়াসিংটন পাগল,—কত পাগলের নাম করিব? এ দেশেও এ যুগে তেমনই কয়টা পাগল জুটিয়াছে, যেমন—গন্ধী, চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন, শরৎ ঘোষ, সুরেশ ডাক্তার, নৃপেন্দ্রচন্দ্র, বাদশা মিঞা, লজপৎ, মতিলাল, মহম্মদ আলি, কিচলু। দুঃখ এই, এ সব ভাবের পাগল নাচিয়া নাচিয়া আগে ছুটিয়াছে, আমরা মহা জ্ঞানীরা পিছে পড়িয়া আছি। তাই কেবল বলি :—

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

পিছায়ে যে আছে-তারে ডেকে নাও
নিয়ে যাও সাথে ক'রে,
কেহ নাহি আসে, একা চ'লে যাও
মহতের পথ ধ'রে।
পিছু হ'তে ডাকে মায়ের কাঁদন
ছিঁড়ে চ'লে যাও মোহের বাঁধন
সাধিতে হইবে প্রাণের সাধন—
মিছে নয়নের জল ভাই!

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানুষের জীবন-নাটকের প্রথমাঙ্ক হইতেই তাহার চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের ধারা পারিপার্শ্বিক প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যে মানুষ তাহার চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের নিকষ-রেখা জাতির জীবনে ইতিহাসের ছত্রে ছত্রে রাখিয়া যায়, তাহার চরিত্রগঠনের মূল অনুসন্ধান করিলেই এ কথার যথার্থতা সপ্রমাণ হয়। মানুষের চরিত্র-বিকাশের মূলে এই তিনটি প্রধান লক্ষ্যের বিষয় :—

(১) ক্ষেত্র,

(২) বীজ,

(৩) পারিপার্শ্বিক অবস্থা।

উদ্ভিদ্-জগতে যেমন দেখিতে পাই, ক্ষেত্র, বীজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল হইলে সুফল উৎপন্ন হয়, মানব-জগতেও তেমনই। আজ চিত্ত-রঞ্জন কেন এত বড় হইয়াছেন, ইহা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে চিত্ত-রঞ্জনের উদ্ভবের ক্ষেত্র, বীজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা বুঝিতে হইবে।

ক্ষেত্র

প্রথমেই ক্ষেত্রের কথা বলি। চিত্তরঞ্জন কলিকাতায় জন্ম-গ্রহণ করেন, এ কথা সত্য। ১২৭৭ সালের ২০শে কার্ত্তিক কলিকাতার পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটে এক বাসাবাটীতে চিত্তরঞ্জনের জন্ম হয়। কিন্তু কলিকাতা প্রত্যক্ষে তাঁহার জন্মস্থান হইলেও পদ্মার পারে বিক্রমপুরই পরোক্ষে তাঁহার জন্মভূমি। কেন না, সেই প্রাচীন গৌড়ের নদীমেখলা শস্যশ্যামলা এই সুন্দরী পুরী তাঁহার পিতৃপিতামহের জন্মস্থান—জীবনের লীলাভূমি। সেই মাটীতে, সেই বাতাসে যে দাশ-পরিবারের অস্থিমজ্জা গড়িয়া উঠিয়া-ছিল, সেই দাশ-পরিবারের আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভাব-ধারা, ভাবনা-চিন্তা, গতি,

প্রকৃতি—সকলই চিত্তরঞ্জনে স্বপ্রকাশ করিয়াছিল। গৌড়-বঙ্গের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হইবার পরেও যে জলে, যে মাটীতে, যে বাতাসে বাঙ্গালীর স্বাধীন চিন্তার ও স্বাধীন বৃত্তির ধারা শতসৌরকরোজ্জ্বলরেখায় অঙ্কিত ছিল, ধনধান্যে ভরা জ্ঞানগরিমোজ্জ্বলা বাণিজ্যসম্পদ্‌শোভায় হাস্যাননা যে ভূমির মাটীতে ও জলবাতাসে যে স্বাধীন চিন্তার বা স্বাধীন বৃত্তি বিকাশ সম্ভবপর,দাশপরিবারে বা চিত্তরঞ্জনে তাহা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছিল।

বিক্রমপুর পূর্ব্ববঙ্গে সম্ভ্রান্ত বর্দ্ধিষ্ণু পরগণা—তাহার কেন্দ্র ভীষণা অথচ মনোহারিণী পদ্মাতটস্থ বিক্রমপুর গ্রাম। বিদ্যাবুদ্ধি-পাণ্ডিত্যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিক্রমপুরের খ্যাতি। বৌদ্ধযুগে বিক্রমপুর অগাধ পাণ্ডিত্যের লীলাভূমি ছিল। সেই জ্ঞানগরিমায় উজ্জ্বল দৃপ্ত হুতাশন সম শীলভদ্র,দীপঙ্কর ও বীরদেব আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সুবর্ণাক্ষরে নামাঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। সেই অগাধ জ্ঞানের অভিব্যক্তি হইয়াছিল স্বাধীন চিন্তার অব্যাহত গতিপ্রবাহে। জীর্ণ ভ্রান্ত সংস্কার—যাহা ন্যায়ের ও সত্যের স্বপ্রকাশে অন্তরায়স্বরূপ—দূরে যাউক সে সংস্কার, সত্যের আলোকে, ন্যায়ের আলোকে জগৎ আলোকিত হউক—ইহাই ছিল সেই জ্ঞান-পিপাসার আকুল আকাঙ্ক্ষা। ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য—ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা ব্যাহত করিয়া ভ্রান্তিময় সংস্কার প্রসারিত হয়, ইহা কাম্য হইতে পারে না। এই স্বাধীন চিন্তা, এই স্বাধীন আকাঙ্ক্ষা, এই স্বাধীন আকুলি-বিকুলি—ইহাই বিক্রমপুরের বৈশিষ্ট্য। পরের দেওয়া অন্যায়, পরের দেওয়া অসত্য বোঝার মত যুগযুগান্তর ঘাড়ের উপর সিন্ধবাদের দ্বীপবাসী বৃদ্ধের মত স্কন্ধে চাপিয়া থাকিবে—আমি আমার বিবেক ও জ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়া কাপুরুষের মত নীরব থাকিব—ইহা বিক্রমপুরের অভিধানে অসম্ভব। ইহা হইতেই বিক্রমপুরে বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধত্বের প্রবল বিকাশ, ব্রাহ্ম সংস্কারের যুগে ব্রাহ্মত্বের বন্যাপ্রবাহ, স্বদেশী ও বয়কটের যুগে শাসন-বাঁধনের বিপক্ষে তুমুল আন্দোলন, আর আজ অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের দিনে চিত্তরঞ্জনের উদ্ভব।

বলিতেছি না, এই ব্যক্তিত্বের বিকাশ—এই সকল রকম বাঁধন-কসনের বিপক্ষে বিদ্রোহ-বৃত্তি সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর। সে কথা বিচার করিবার স্থল ইহা নহে। আমার বক্তব্য, বিক্রমপুরের জলবায়ু বা মাটীর গুণ এমনই যে, সেখানে কোনও বাঁধন-কসনই মুক্তিকামী মনকে চাপিয়া রাখিতে পারে না। সে মাটীর, সে বাতাসের, সে আকাশের,—এক কথায় সে আবহাওয়ার আবছায়ায় যে পরিবারের জন্ম ও শ্রীবৃদ্ধি, চিত্তরঞ্জন সেই পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া চিত্তরঞ্জন ব্যতীত আর কিছু হইতে পারেন না।

বীজ

তাহার পর বীজ। এই বিক্রমপুরের উর্ব্বর ক্ষেত্রের সে বীজ হইতে চিত্তরঞ্জনের উদ্ভব, এইবার তাহাই বলিব। বিক্রমপুর পরগণায় তেলিরবাগ গ্রাম। ইহাই চিত্তরঞ্জনের পিতৃপিতামহের আবাসভূমি—পরম পুণ্যময়ী জন্মভূমি। ইহাঁরই পীযুষস্তন্যধারায় চিত্তরঞ্জনের পূর্ব্বপুরুষগণ পালিত ও পুষ্ট। প্রসিদ্ধ যতুনন্দন বৈদ্যবংশে চিত্তরঞ্জনের জন্ম। পুরাকালে বিক্রমপুরের সুখসমৃদ্ধির সময় বিক্রমপুরে এই বৈদ্যবংশের রতনকৃষ্ণ দাশ স্বনামখ্যাত ছিলেন। তাঁহার দানশৌণ্ডতা ও অতিথিপরায়ণতা লোকের মুখে মুখে রটিত হইত। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জগদ্বন্ধু দাশ চিত্তরঞ্জনের পিতামহ। তিনি মোক্তারী করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতেন।

দানশৌণ্ডতা

দাশ-পরিবার চিরদিন দানশৌণ্ডতার জন্য প্রসিদ্ধ। দাশ-পরিবারের অন্যতম শ্রীযুত সুকুমাররঞ্জন দাশগুপ্ত জগদ্বন্ধুর দানশৌণ্ডতার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন :—"এই বংশের দোষ কি গুণ বলিতে পারি না, সঞ্চয়ের দিকে কাহারও বড় দৃষ্টি দেখা যায় না। জগদ্বন্ধুর ক্ষেত্রেও এ নিয়মের

ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তাঁহার উপার্জ্জনের অধিকাংশই দুঃস্থ আত্মীয়-স্বজনের ভরণপোষণে এবং স্বগ্রামের অতিথিশালায় ব্যয়িত হইত। তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থে যথাযথ অতিথিসেবা হয় কি না, ইহা পরীক্ষা করাও তাঁহার এক কাজ ছিল। কথিত আছে, একদিন মধ্যরাত্রে তিনি নৌকা করিয়া ছদ্মবেশে গ্রামের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং লোক দিয়া অতিথিশালায় সংবাদ পাঠাইলেন যে, একজন ক্ষুধার্ত্ত অতিথি উপস্থিত। অত রাত্রে অতিথিশালার কর্ম্মচারীরা কেহই উঠিয়া অতিথির অভ্যর্থনা করিতে চাহিল না, বিরক্ত হইয়া লোকটিকে ফিরাইয়া দিল। তখন জগদ্বন্ধু অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া নিজবেশে গৃহে আসিয়া কর্ম্মচারিগণকে অতিশয় তিরস্কার করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দিলেন। অতিথিসেবায় তাঁহার এইরূপ যত্ন ও উৎসাহ ছিল।"

চিত্তরঞ্জনের মুক্তহস্তে দানের কথা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা ইহাতে বিস্মিত হইবেন না। যে বংশের বীজ হইতে চিত্তরঞ্জনের উদ্ভব, তাঁহার এই দান-প্রবৃত্তি অস্থিমজ্জাগত। যে নিজের কথা—নিজের আপনার জনের ভবিষ্যতের কথা না ভাবিয়া পরের দুঃখ-মোচনে অকাতরে দান করিতে পারে, তাহার পক্ষে ত্যাগ ও বৈরাগ্য বড় কথা নহে। মনই সব। মন যে উপাদানে গঠিত হয়, সেই উপাদানের আনুষঙ্গিক ফলও প্রদান করে। তাই চিত্তরঞ্জনের মন পরে এক ভাবের প্রেরণায় একদিনে মাসিক ৫০ হাজার টাকার আয় হেলায় বিসর্জ্জন দিয়াছিল।

কারুণ্য

জগদ্বন্ধু বড় করুণপ্রকৃতির লোক ছিলেন। এ সম্বন্ধেও সুকুমার বাবু একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। বৃদ্ধবয়সে এক দিন জগদ্বন্ধু পাল্কী চড়িয়া একগ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতেছিলেন, পথে দেখিলেন, একজন ব্রাহ্মণ অতিশয় ক্লান্তভাবে পথ হাঁটিয়া যাইতেছেন। তিনি তখনই ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, আপনি এই পাল্কীতে চড়িয়া আপনার গন্তব্য

স্থানে যান।" এই বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণকে পান্ধীতে চড়াইয়া নিজে অনেকটা দূর-পথ পায়ে হাঁটিয়া চলিয়া আসিলেন।

চিত্তরঞ্জনের জীবনে পিতামহের এ কারুণ্যের উৎস শতধারে উৎসারিত হইয়াছিল। লোকের দুঃখ-কষ্ট শুনিলে অনেক সময়ে তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠে। কত কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তি, কত মামলায় বিজড়িত ব্যক্তি, কত উৎপীড়িত অত্যাচারিত ব্যক্তি তাঁহার করুণার অমিয়ধারায় সিক্ত হইয়া শান্তি ও সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা শুনিয়াছি,কোনও কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা তাঁহার নিকট হইতে একখানি খামে মোড়া চিঠি পাইয়াছিলেন। চিঠি খুলিয়া দেখেন, উহার মধ্যে ৫০০৲ টাকার এক চেক। দেখিয়াই তাঁহার চক্ষু স্থির। দাশ সাহেব এ কি ভুল করিলেন, কাহাকে চেক দিতে কাহাকে দিলেন! দৌড়িয়া তিনি দাশ সাহেবকে ভুল বুঝাইতে গেলেন। চিত্তরঞ্জন তাঁহার কথা শুনিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ও চেক আপনার। শুনিয়াছি, আপনার একটি বয়স্থা অবিবাহিতা কন্যার জন্য আপনি বড় দায়ে পড়িয়াছেন; তাই চিঠির মধ্যে ঐ চেক দিয়াছি। হাতে দিতে বড় লজ্জা করিতেছিল বলিয়া চেক দিয়াছি।" এমন কত গল্প "দাশ সাহেবের" নামে আছে। সে সব উল্লেখ করিতে গেলে গ্রন্থ-কলেবর বর্দ্ধিত হইয়া যায়।

বিদ্যায় অনুরাগ ও ধর্ম্মে মতি

দাশ-পরিবার বিদ্যানুরাগের ও ধর্ম্মে মতির জন্যও চিরপ্রসিদ্ধ। জগদ্বন্ধু বিদ্যানুরাগী ও কবি ছিলেন। এ সম্বন্ধে সুকুমার বাবু লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালা কবিতায় তাঁহার বেশ নৈপুণ্য ছিল। তদ্রচিত 'নারায়ণসেবা ও হরির লুঠের' পুঁথি এখনও বিক্রমপুরের সকল গৃহেই আদরের সহিত পূজার সময় পঠিত হইয়া থাকে। উহা যেমন সরল ভাষায় লিখিত, তেমনই সুন্দর শ্রুতিমধুর ছন্দোবদ্ধ। উহার ভাব ও রচনা সত্যই এমনই চমৎকারপ্রদ যে, ইহার পঠনসময়ে বাড়ীর আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই

খুব আগ্রহের সহিত প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়া থাকে। উহার আখ্যায়িকাগুলিও বেশ মর্ম্মস্পর্শী ও হৃদয়-গ্রাহী।"

এ সকল গুণও চিত্তরঞ্জনে অতিমাত্রায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। চিত্তরঞ্জনের কবিত্বশক্তি তাঁহার "সাগর-সঙ্গীত", "মালঞ্চ", "মালা", "অন্তর্য্যামী" প্রভৃতির প্রাণস্পর্শী ভাব ও ভাষায় বিকসিত হইয়াছে। আর সকলের চেয়ে যেটা বড়, তাঁহার হৃদিতন্ত্রী যে সুরে বাজিয়াছে, তাহা বাঙ্গালার সুর, খাঁটী বাঙ্গালী কবির সুর। সে সুর কোটাবালাখানায় বাজে না, বাঙ্গালীর চণ্ডীমণ্ডপের আটচালায়, গোছা গোছা সবুজ ধানের মাঠে, গোচারণের ধূলিমাখা গ্রাম্যপথে, ফুলে ফুলে ভরা রাঙ্গা উষার রাঙ্গা আভায় রক্ত-রাঙ্গা বাঙ্গালার নদীর চিকণ জলে সেই সুর বাজে। তাহাতেই বাঙলার প্রাণের কথা ফুটিয়া উঠে—যে মন একদিন ফুটিয়াছিল, চণ্ডিদাস গোবিন্দদাসের প্রাণময় গীতিকাব্যে।

এখানে আমরা চিত্তরঞ্জনের কাব্যরচনার সমালোচনা করিতে বসি নাই, কেবল পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইতেছি মানুষটার। সে মানুষটা কেমন? বিলাত যায়, ব্যারিষ্টার হয়, সাহেবী সাজে থাকে, সাহেবী ঢঙ্গে থাকে, সাহেবী চালে বক্তৃতা দেয়, পয়সা উপার্জ্জন করে। এ সাহেব— এ "দাশ সাহেব" আজ বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর—মোটর-চড়া ক্লাব-মজলিসে যাওয়া বাঙ্গালীর নহে—দরিদ্র মুদী মোদক শ্রমিক বাঙ্গালীর, চাষের ক্ষেতের ও খামার-মরাইয়ের বাঙ্গালীর হৃদয়ের রাজা হন কি গুণে? বাঙ্গালার সবুজ মাঠের বাঙ্গালীর প্রাণের সাড়া ব্যারিষ্টার দাশ সাহেবের প্রাণে গিয়া পৌঁছায় কেন? আমাদের মনে হয়, এই দাশ সাহেবের অন্তর্নিহিত এমন একটা দুর্জ্জয় শক্তি ছিল, যাহাকে আমাদেরই রক্ত-মাংসে গড়া খাঁটি বাঙ্গালীর ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছে, উহাতেই অনুপ্রাণিত করিয়াছে। সে ভাব তাঁহার কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার জীবনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তাই চিত্তরঞ্জনের কবিতায় আমরা আমাদের বড়

আপনায় বৈষ্ণব কবিগণের মধুর প্রভাব দেখিতে পাই; তাই চিত্তরঞ্জন ব্রাহ্ম-সংসারের একজন হইলেও ব্রাহ্ম-প্রভাবে প্রভাবিত হন নাই—বৈষ্ণবের ভাবের সহিত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। উহা হইতেই চিত্তরঞ্জনে বৈষ্ণবের বৈরাগ্য ও বৈষ্ণবে প্রীতি মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে কথা পরে আলোচনা করিব। এখানে এইটুকু বলিয়া রাখি যে, পিতামহের কবিত্ব-শক্তি ও ধর্ম্মে অনুরক্তিও বহুল পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বীজের প্রভাব ইহাতে সপ্রমাণিত।

পিতার প্রভাব

জগবন্ধুর একমাত্র পুত্র ভুবনমোহন কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত এটর্ণি ছিলেন। সেই সময়ে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব জাগিয়া উঠিতেছিল। বহু বাঙ্গালীর ছেলে কলেজে পড়িতে পড়িতে বিজাতীয় শিক্ষার ফলে স্বধর্ম্ম ভয়াবহ মনে করিতে শিখিতেছিলেন। তাঁহাদের মনে পৌত্তলিকতার প্রতি ঘৃণার ভাব বদ্ধমূল হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে। ভুবনমোহন ও তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত পুত্র দুর্গামোহন এই নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। উপনিষদুক্ত "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্রহ্মোপাসনাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম—পৌত্তলিকতা হিন্দুধর্ম্ম নহে,—এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা ব্রাহ্মরূপে নাম লিখান। তাঁহাদের এই ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তনের আর একটা কারণ ছিল। হিন্দুধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম্মের আনুসঙ্গিক এমন কতকগুলি অঙ্গ ছিল, যাহা তাঁহারা কুসংস্কারমূলক ও অত্যাচারপ্রবর্দ্ধক বলিয়া মনে করিতেন। যাহা অন্যায়, যাহা অসত্য, যাহা অত্যাচারের বন্ধন,—তাহা এই দাশ-বংশ কখনও মাথা পাতিয়া গ্রহণ করেন নাই। ভুবনমোহন ও দুর্গামোহনও যে করিবেন, এমন হইতে পারে। হইতে পারে, তাঁহারা ভ্রান্ত—অন্ততঃ হিন্দুর মাপকাঠিতে ভ্রান্ত, কিন্তু যাহা তাঁহারা অন্যায় বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন, তাহার বিপক্ষে বিদ্রোহী হওয়াই তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

চিত্তরঞ্জন প্রথম জীবনে ব্রাহ্ম থাকিলেও পরে হিন্দু হইয়াছিলেন। কেন? এ কথার সহজ ও সরল উত্তর এই যে, যে ধাতুতে চিত্তরঞ্জনের মনটি গঠিত, সেই ধাতুতে ইহাই সম্ভব। চিত্তরঞ্জন বৈষ্ণবধর্ম্মের মধুর রস যে দিন আস্বাদ করিয়াছিলেন, সেই দিনই উহাতে মজগুল হইয়াছিলেন, বুঝিয়াছিলেন, এই ধর্ম্মে যে মধু—যে অমৃত আছে, উহার সহিত অন্যায় ও অসত্যের কোনও সংস্রব থাকিতে পারে না। তবে কুসংস্কার, কুপ্রথা—উহা স্বতন্ত্র কথা। চিত্তরঞ্জনের স্বাধীন মুক্তিকামী মন সে অন্যায় বন্ধনের মধ্যে যাইতে চাহে নাই। তিনি হিন্দুসমাজের আচার-ব্যবহারের মধ্যে সে সব কুসংস্কার বলিয়া মনে করিয়াছেন,হইতে পারে,হিন্দুর দৃষ্টিতে সে সকল কুসংস্কার নহে, কিন্তু তাঁহার বিবেক তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছে উহা অন্যায় ও অগ্রাহ্য,—তাই তিনি উহাকে বিষবৎ বর্জ্জন করিয়াছেন,লোকের স্তুতি-নিন্দা তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। কিন্তু তিনি হিন্দু বৈষ্ণবধর্ম্মে যেটুকু সত্য ও ন্যায়ের সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহা পুনর্গ্রহণ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই।

পিতার উদারতা ও স্বদেশপ্রেম

চিত্তরঞ্জন পিতা ভুবনমোহন হইতে আরও কয়েকটি সদ্‌গুণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ভুবনমোহন নির্ভীক, তেজস্বী, স্বদেশ ও স্বজনপ্রেমিক ছিলেন। ব্রাহ্ম ভুবনমোহন প্রথমে Brahmo public opinion নামক এক সংবাদপত্রের সম্পাদকতা করিতেন এবং পরে Bengal public opinion নামক সংবাদপত্রের পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন। পত্রসম্পাদনকালে ভুবনমোহনের নির্ভীকতা ও তেজস্বিতা পদে পদে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারই দাশ-বংশের সুকুমার বাবু ইহার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন :—"একবার তিনি Bengal public opinion পত্রে কলিকাতা হাইকোর্টের এক বিচারপতির বিচারের ত্রুটি উল্লেখ করিয়া তীব্র সমালোচনা করেন। ইহার কিছুকাল পরেই সেই বিচারপতির নিকট ভুবনমোহন এক প্রাণ-

দণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত আসামীর পক্ষে আপীল করেন। বিচারক তখন তাঁহার আপিলে তেমন মন না দিয়া উদাসীনতার ভাব প্রকাশ করেন। কর্ত্তব্য-পরায়ণ ভুবনমোহন তখন বলিয়াছিলেন,—"আমার প্রতি ধর্ম্মাধিকরণের যদি কোনও বিরক্তিভাব থাকে, সেইজন্য প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত একজন আসামী ন্যায়বিচার হইতে বঞ্চিত না হয়, ইহাই আমি আশা করি।' তাঁহার এই তেজোগর্ভ স্পষ্ট কথায় বিচারক সন্তুষ্ট হইয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া আসামীকে অব্যাহতি দান করেন।"

এ নির্ভীকতা—এ তেজস্বিতা—এ স্পষ্টবাদিতা ভুবনমোহনের পুত্র চিত্তরঞ্জনও অতিমাত্রায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার দৃষ্টান্ত চিত্ত-রঞ্জনের জীবনে অবিচ্ছিন্ন ভাবে অনেক পাওয়া যায়।

ভুবনমোহনের বহু রচনায়-স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। দেশের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের ফল্গুপ্রবাহ অন্তঃসলিলার মত তাঁহার হৃদয়-খাতে অনুক্ষণ বহিয়া যাইত—সময় বা সুযোগ উপস্থিত হই-লেই উহা ফুটিয়া কথায় ও কাজে স্বপ্রকাশ করিত। পিতায় যে স্বচ্ছ সরল মন্দাকিনীধারা অন্তঃসলিলা ছিল, পুত্রে তাহা সীতাকুণ্ডের উষ্ণপ্রস্রবণের ন্যায় এটনা-বিসুবিয়সের জ্বালাময় গৈরিক নিঃসারের ন্যায় ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

ভুবনমোহনের এই স্বজাতিপ্রীতি যেমন স্বদেশের বৃহৎ কেন্দ্রে আস্থৃত ছিল, তেমনই নিজ আত্মীয় স্বজন ও গ্রামবাসীরূপ ক্ষুদ্র কেন্দ্রেও যে উহা নিবদ্ধ ছিল না, এমন নহে। কথায় আছে :—

অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম।
উদারচরিতানান্তু বসুধৈবকুটুম্বকম্॥

এ আপনার ও পর,—এমন ধারণা লঘুচেতা সঙ্কীর্ণমনাদেরই হইয়া থাকে ; কিন্তু যাঁহারা উদারচরিত,সমস্ত পৃথিবীর লোকই তাঁহাদের আত্মীয় কুটুম্ব। এটা যে খুব বড় কথা, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ছোটভাবে ইংরেজীতেও একটা কথা আছে :—charity begins at home, সহৃদয়তা

ঘরেই আরম্ভ হয় অর্থাৎ আপনার লোকজনের উপরেই প্রথমে মানুষের দয়াদাক্ষিণ্য আরম্ভ হয়, তাহার পর অপর পাঁচ জনের উপর। ভুবনমোহন বড় রকমে স্বদেশ ও স্বজাতির কথা সংবাদপত্রে আলোচনা করিতেন, ইহাতে তাঁহার উদারচরিতের পরিচয় পাওয়া যাইত। আবার ছোটরকমেও তিনি ঘরের পাঁচজনের, গ্রামের লোকের ও আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধবের কথাও ভাবিতেন, তাহাদের সুখ-দুঃখে সমবেদনা বা সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন। কেবল কথায় নহে—বিধুভূষণের ঠাকরুণদিদির মত কেবল আহা উহু করিতেন না, কাজে—মুক্তহস্তে দানের থলি খুলিয়া বিপন্ন দুঃস্থ অভাবগ্রস্ত আপনার জনের অভাব-দুঃখ-মোচনে সর্ব্বদা অগ্রসর হইতেন। তাঁহার দাশ-বংশীয় সুকুমার বাবু এতৎসম্পর্কে লিখিয়াছেন :—"তিনি প্রাচীনপন্থী হিন্দুদের মত সব বিষয়েই উদার ছিলেন। তাঁহার সাংসারিক জীবনে দরিদ্র আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত ব্যবহারে তাঁহার স্নেহপ্রবণ সরল অন্তঃকরণের পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহাদিগের গৃহে প্রায়ই যাতায়াত ও মেলামিশিতে তাঁহার নিরহঙ্কারিতা প্রকাশ পাইত। এইরূপ সহৃদয়তা ও এতটা নিরহঙ্কারিতা, এমন কি, চিত্তরঞ্জনের মধ্যেও বিকাশ পায় নাই। কারণ, ভুবনমোহনের অমায়িকতা একটা দেবদুর্ল্লভ সামগ্রী ছিল। যাহারা একবার তাহার নিদর্শন পাইয়াছিল, তাহারা জীবনে উহা ভুলিতে পারে নাই। দুঃস্থ আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবদের সাহায্যের জন্য তিনি একবারে মুক্তহস্ত ছিলেন। ভুবনমোহনের এই সরলতা ও সহৃদয়তাই সর্ব্বনাশের মূল হইয়াছিল। এটর্ণি হইয়া তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু সঞ্চয় ত দূরের কথা, শেষ জীবনে তাঁহাকে ইনসলভেন্সি গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।... তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র দুর্গামোহন নিজের যথাসাধ্য দিয়া ভ্রাতাকে কয়েকবার ঋণমুক্ত করিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু তাহাতেও ভুবনমোহনের সব ঋণ শোধ হইল না, তিনি বাধ্য হইয়া ইনসলভেন্সি কোর্টের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই অসম্ভাবিত দশা বিপর্য্যয়েই বোধ হয় তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়।"

এই যে স্বজনপ্রতিপালন-স্পৃহা, এই যে দরিদ্র, বিপন্ন ও দুঃস্থের প্রতি করুণা, এই যে নিঃস্বার্থ পরোপকারস্পৃহা, এই যে দানশীলতা, সহৃদয়তা—ইহা চিত্তরঞ্জনে পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

পরার্থে আত্মত্যাগ

এই যে পরের জন্য ত্যাগের প্রবল আকাঙ্ক্ষা—এই আকুল আকাঙ্ক্ষাই চিত্তরঞ্জনকে ত্যাগের পথে, মুক্তির পথে, সন্ন্যাসের পথে প্রয়াণ করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। চিত্তরঞ্জন স্বেচ্ছায় পিতৃঋণ স্কন্ধে লইয়াছিলেন, চিত্তরঞ্জন নিজের অভাবগ্রস্ত অবস্থাতেও অভাবগ্রস্তের অভাব মোচন করিয়া কপর্দ্দকশূন্য হইয়াছেন, আবার লক্ষপতি অবস্থায় স্বেচ্ছায় বাৎসরিক * লক্ষাধিক মুদ্রার আয় এক মুহূর্ত্তে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। এ ত্যাগের মূল বুঝিতে হইলে কেবল চিত্তরঞ্জনকে বুঝিলে হইবে না, বুঝিতে হইবে বিক্রমপুরকে, বুঝিতে হইবে দাশ-বংশকে, বুঝিতে হইবে জগদ্বন্ধু ভুবন-মোহনকে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা

চিত্তরঞ্জনের ক্ষেত্র ও বীজের কথার আলোচনা করা হইল, এইবার তাঁহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা ধরা যাউক। দেখা যায়, মুক্ত আকাশে, মুক্ত বাতাসে গাছপালা যত সতেজ, সবল ও সুস্থ হয়, এমন অন্য কিছুতে হয় না। চারিদিকের যে অবস্থার মাঝখানে গাছপালা গজাইয়া উঠে, তাহারই প্রভাব তাহাতে ফুটিয়া উঠে। মানুষের জীবনেও এমনই ঘটিয়া থাকে, ইহার ব্যতিক্রম কচিৎ কোথাও হইয়া থাকে।

বাসন্তী দেবী

চিত্তরঞ্জন যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য হইতে আপনার ব্যক্তিত্বের বিকাশ করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব যে তাঁহার স্বভাবের অনুকূল হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব—

যাহারা জীবনযাত্রার প্রধান সঙ্গী, তাঁহাদের দৃষ্টান্তে চিত্তরঞ্জন কি ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা ভুবনমোহন ও জগদ্বন্ধুর প্রভাবের কথায় বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। চিত্তরঞ্জনের নিকট-আত্মীয় প্রায় সকলেই স্বাধীনচেতা, হৃদয়বান্, স্বজনপ্রতিপালক ও স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। সে প্রভাব চিত্তরঞ্জনে বাল্য হইতেই স্বপ্রকাশ হইয়াছিল। সকলের অপেক্ষা যিনি জীবনের সুখ-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে অংশভাগিনী —চিত্তরঞ্জনের সেই সহধর্ম্মিণী মহীয়সী রমণী। বস্তুতঃ শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী – যাঁহার নাম আজ ভারতের জাতীয় মুক্তির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া রহিল—আমাদের বাঙ্গালীর ঘরের আদর্শ-গৃহিণী। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-শিক্ষিতা উপাধিধারিণী মহিলা নহেন, তিনি হিন্দু গৃহস্থের কুলবধূর মত স্বভাবতঃ সুমার্জ্জিতা, সুনম্রা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি-শালিনী, কর্ত্তব্যবুদ্ধিপরায়ণা, গভীর ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্না, ধীরা, স্থিরা, শান্তা, মৃদুভাষিণী, স্বজনপ্রতিপালিনী, অতিথি-সেবাপরায়ণা, দরিদ্র-আতুরে করুণা-পরায়ণা। তিনি উপাধিধারিণী না হইলেও শিক্ষিতা, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি আছে। অমৃতসরের ১৯১৯ সালের নিখিল ভারতীয় মহিলা-সম্মেলনে বাসন্তী দেবী সভানেত্রী-রূপে বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন,—

> "মনে রাখিবেন, আমাদের আদর্শ—সতী, সাবিত্রী ও সীতা। যদি প্রয়োজন মনে হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান কালের উপযোগী করিয়া লইবার জন্য সেই ভারতীয় আদর্শকে সংস্কৃত সংশোধিত করিয়া লউন, কিন্তু ভারতের সেই সনাতন আদর্শকে নষ্ট বা ক্ষুণ্ণ করিতে প্রয়াস পাইবেন না।"

এইখানেই আমরা বাসন্তী দেবীর ভিতরের মানুষটার খবর পাই। সীতা-সাবিত্রী যাহার আদর্শ, তিনি যে স্বামীর সুখে দুঃখে অংশ ভাগিনী, জ্ঞানার্জ্জনে ও সাহিত্যচর্চ্চায় উৎসাহদায়িনী সহযোগিনী, ধর্ম্মে কর্ম্মে ও সংসার-প্রতিপালনে পরম সহায়িকা সেবিকা, উচ্চাকাঙ্ক্ষায় জলন্ত

আগ্রহবর্দ্ধিকাহস্তে অগ্রগামিনী এবং স্বজাতি ও স্বদেশসেবার মূর্ত্তিমতী শক্তি রূপে সঙ্গের সঙ্গিনী হইবেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি থাকিতে পারে? বড় সৌভাগ্যে চিত্তরঞ্জন এমন মহিমময়ী জীবনসঙ্গিনী পাইয়াছিলেন—যে শক্তিরূপিণী মহীয়সী নারীর সুখে অচঞ্চল, বিপদে স্থির, প্রশান্ত, উজ্জ্বল পুণ্য-শরীর-শ্রীর সম্মুখে দেশবাসীর মন ভক্তি-শ্রদ্ধায় আপনিই নত হইয়া পড়ে।

মনে করুন সেই দিন—যে দিন পুলিস বাঙ্গালা সরকারের আদেশে রসা রোডের বাড়ীতে চিত্তরঞ্জনকে ধরিতে আসিয়াছে। চিত্তরঞ্জন হাত-মুখ ধুইয়া চা পান করিতে বসিয়াছেন—তখন অপরাহ্ন। হঠাৎ খবর আসিল, পুলিশ দ্বারে উপস্থিত। বাসন্তী দেবীর মুখে কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল না—চিত্তরঞ্জন প্রশান্তমুখে বলিলেন, "আমি প্রস্তুত।" পুলিশ-কর্ম্মচারী পরোয়ানার পরিচয় দিবার পর বাসন্তী দেবী কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার খাবার কি এখান হইতে পাঠান হইবে?" চিত্তরঞ্জন গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "না, আবশ্যক নাই। জেলের কয়েদী যাহা খাইতে পায়, তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট—আমি এক পয়সার মুড়িমুড়কী পাইলেই যথেষ্ট জ্ঞান করিব।" তাহার পর পুলিশ যখন চিত্তরঞ্জনকে গাড়ীতে উঠাইল, তখন বাসন্তী দেবী পুরনারীদিগের সহিত মিলিত হইয়া শুভ শঙ্খ ও হুলুধ্বনির সহিত হাসিমুখে স্বামীকে জেলে বিদায় দিলেন।

যেমন স্বামী, তেমনই সহধর্ম্মিণী! দেশ-মাতৃকার আশীর্ব্বাদে দেশে যুগে যুগে এমনই সুসন্তানের আবির্ভাব হউক, দেশ ধন্য হউক!

এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখি, কথাটা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

চিররঞ্জন

চিত্তরঞ্জন কেন এক পয়সার মুড়িমুড়কীর কথা বলিয়াছিলেন, তাহা অনেকে জানেন না। শুনিয়াছি, স্নেহের পুত্র চিররঞ্জন হাজতে কয়েক

ঘণ্টা অনাহারের পর মুড়িমুড়কী খাইতে পাইয়াছিল, ইহাই চিত্তরঞ্জনের এই কথার মূল। এই চিররঞ্জন বাপ-মায়ের বড় আদরের একমাত্র পুত্র। সেই পুত্র আজীবন ভোগবিলাসে লালিত-পালিত, দুঃখের মুখ কখনও দেখে নাই। কিন্তু ভাবের প্রেরণায় সে অগ্নি-পরীক্ষার সময় সর্ব্বাগ্রে বিপদের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িল, সরকারের নূতন আইন অন্যায়ের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মনে করিয়া আইন লঙ্ঘন করিবার মানসে স্বয়ং নেতারূপে ভলাণ্টিয়ার দল বাহির করিয়া সহকর্ম্মীদের সহিত জেলে গেল। জনক-জননীর পুণ্য-সংস্পর্শে দেশ-প্রেমে অনুপ্রাণিত বালক নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা একবারও বিচার করিয়া দেখিল না। বলিতে লজ্জা করে, কোনও ইংরেজ-সম্পাদিত সংবাদপত্র এই ভাবের ত্যাগ-স্বীকারকে Theatricals আখ্যায় বিভূষিত করিয়াছিল। বোধ হয়, এই কাগজখানা Ship money না দেওয়ার ফলে Pym ও Hampdenএর জেল যাওয়াটাকে Theatricals বলিতে পশ্চাৎপদ হইবে না!

বঙ্কের পঞ্জর-প্রতিম নয়নানন্দ সন্তান যখন হাজতে গেল, তখন জননী বাসন্তী দেবী কি করিয়াছিলেন? তিনিও পুত্রের প্রদর্শিত পথে প্রয়াণ করিলেন—স্বয়ং সঙ্গিনীগণ সঙ্গে ভলণ্টিয়ার হইয়া পথে খদ্দর বেচিতে চলিলেন। যাইবার পূর্ব্বে স্বামীর অনুমতি চাহিলে চিত্তরঞ্জন ধীর-গম্ভীরস্বরে বলিয়াছিলেন,—"ভবিষ্যতের দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে যদি প্রস্তুত হইতে পার, যাও, আমার আপত্তি নাই।" এ কি সামান্য কথা! সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত উচ্চপদস্থ গৃহস্থের কুলবধূ—প্রকাশ্যপথে পুলিশের হস্তে লাঞ্ছিত হইতে যাইতেছেন, অথচ স্বামী নির্ব্বিকার, অটল, অচল! যাহা তিনি ন্যায় বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, যাহা তিনি দেশের মুক্তির পক্ষে মঙ্গলকর বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহার জন্য তিনি সকলই বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত —সে যজ্ঞে আহুতি দিতে দারা-সুত-পরিবার—এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ। এমন না হইলে চিত্তরঞ্জন!

আর সেই মহীয়সী রমণী? তাঁহার কথা কি বলিব? পুরাণে

পড়িয়াছি জনার কথা। প্রবসকে জনার ভূমিকায় প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী তিনকড়ি দাসীর সেই—"শাবকের অন্বেষণে সিংহিনী যাইবে," এখনও যেন বাঙ্গালীর কর্ণে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়! আর ইতিহাসে বুয়র-যুদ্ধে পুত্রহারা লর্ড রবার্টসের কথা পড়িয়াছি। বুয়র-যুদ্ধকালে লর্ড রবার্টস বৃদ্ধ, সমর-ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিলেই হয়, ক্লাবে একজন সভ্য হঠাৎ খবরের কাগজ খুলিয়া পড়িতে পড়িতে বলিয়া উঠিলেন, "এঁ্যা—ববের পুত্র হতের তালিকায়!"—বব—লর্ড রবার্টস সেই দিনই সমর-কার্য্যালয়ে গিয়া নাম লিখাইয়া আসিলেন, দক্ষিণ-আফরিকার রণক্ষেত্রে সেই বৃদ্ধবয়সে চলিয়া গেলেন।

স্বামী—পুত্র,—জগতে যাহা হইতে নারীর আর কিছু প্রিয় নাই—যাহারা নারীর ইহকাল পরকাল, প্রাণাপেক্ষাও মূল্যবান্, সেই স্বামি-পুত্রকে নিজ জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে ন্যায়ের মর্য্যাদা—সত্যের মর্য্যাদা—দেশের মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত যে মহীয়সী নারী অবিচলিতচিত্তে বিপদ্ ও কষ্টের মুখে প্রেরণ করিতে পারেন, সেই নারী সহধর্ম্মিণীরূপে সুখে দুঃখে জীবনসঙ্গিনী—চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর বিরাট্ পুরুষ হইবেন না কেন?

বৈষ্ণব কবির প্রভাব

আর এক মহান্ সত্যের ও প্রেমের প্রভাব চিত্তরঞ্জনের জীবনের পরতে পরতে বিস্তার করিয়াছিল,—সে আমাদেরই এই বাঙ্গালার মাটীর, বাঙ্গালার জলের বক্ষপঞ্জর হইতে উদ্ভূত—সে বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবির প্রাণস্পর্শী প্রেমের গান, ত্যাগের গান, বৈরাগ্যের গান, মুক্তির গান। শুনিয়াছি, নাচের ভিখারী পথের বৈষ্ণব বাবাজী খঞ্জনী বাজাইয়া হরিনাম করিলে, চিত্তরঞ্জনের নয়ন দুটি জলে ভরিয়া যায়,—রাধাকৃষ্ণের লীলার কথা শুনিতে শুনিতে চিত্তরঞ্জন তন্ময় হইয়া যান। ঠাকুর-দেবতার লীলার গান শুনাইয়া ভিখারী কখনও রিক্তহস্তে চিত্তরঞ্জনের বাড়ী হইতে ফিরে না। এ ভাবটা কতক পরিমাণে মাতা হইতে পুত্রে বর্ত্তিয়াছিল। পরিণত বয়সে চিত্তরঞ্জনের পিতা ও মাতা যখন রোগশয্যায় শায়িত, লোকে বলে,

সেই সময়ে জননীর উপদেশে চিত্তরঞ্জন বৈষ্ণবধর্ম্মের উৎকর্ষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জনের হৃদয় চিরদিনই ভাবপ্রবণ—বিশেষতঃ ব্রাহ্ম সংসারে জন্মগ্রহণ করিলেও আবাল্য হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার একটা প্রাণের আকর্ষণ ছিল। মাতার মৃত্যুর পর হইতেই তিনি হিন্দু বৈষ্ণব-ধর্ম্মের একজন একনিষ্ঠ উপাসক হইয়াছিলেন এবং নিজ সংসারে হিন্দুর নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ প্রবর্ত্তিত করেন; পরন্তু তাঁহার গৃহে গীতাপাঠ, শাস্ত্রব্যাখ্যা ও নামকীর্ত্তনাদি হইতেও দেখা গিয়াছে। ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণে শালগ্রামসম্মুখে অগ্নি সাক্ষী করিয়া রীতিমত তাঁহার সন্তানের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। তবে তিনি সকল বিষয়েই যাহা অন্যায় ও কুসংস্কার বলিয়া মনে করিতেন, তাহা কাহারও মুখ চাহিয়া নিজ সংসারে প্রশ্রয় দেন নাই। সে যাহা হউক, এই বৈষ্ণবকবির গানের প্রতি প্রবল আকর্ষণ চিত্তরঞ্জনের জীবননাটকে অনেক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। চিত্তরঞ্জন 'বাঙ্গলা কবিতার প্রাণের কথায়' বলিয়াছেন:—"সত্যকে ছাড়িয়া দিলে কোন কবিতাই সম্ভব হয় না।" সেই সত্য চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালা বৈষ্ণব-কবির পদাবলীতে দেখিয়াছিলেন—তাহাতেই অবগাহন করিয়া সত্যের ভাবে ভাবুক হইয়াছেন—নিজের জীবনকে সত্যের আস্বাদ দিয়া ভরপুর করিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছেন, এই সত্যই প্রাণ,—অমৃত, সুধা, উহার আস্বাদ পাইলে মানুষ অমর হয়—স্বার্থত্যাগ ত তুচ্ছ কথা, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ অমর বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবির এই অমৃত-সমুদ্রে ডুব দিয়া দুই একটি রত্ন আহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাই তাঁহার 'গীতাঞ্জলিতে' প্রাণের সাড়া পাইয়া প্রতীচ্য চমকিত হইয়াছে, ভক্তিশ্রদ্ধা-নতশিরে তাঁহার পূজা করিয়াছে। এ রসে রসিক, এ ভাবে ভাবুক চিত্তরঞ্জন এ সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন, তাই তাঁহার "বাঙ্গলার গীতি-কবিতা" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন:—"কেহ কেহ বলেন, বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যরূপক। মানুষের নিজের অর্থাৎ বৈষ্ণবকবিগণের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ও সত্যের উপরে নাকি তাহার প্রতিষ্ঠা নহে।

কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা, তাহাকে কল্পনা করিয়া লইয়া ও য়ুরোপীয় সাহিত্যের অভিজ্ঞতাকে সেই কল্পনার সাহায্যে আপনার অভিজ্ঞতা মনে করিয়া লইয়া, সেই অভিজ্ঞতা দিয়া বৈষ্ণব সাহিত্য ও বৈষ্ণব কবিতা বুঝিতে গেলে, বোধ হয়, রূপকের আবশ্যক হয়। কিন্তু বৈষ্ণব কবিদিগের প্রত্যেক অনুভূতি যে তাঁহাদের হৃদয় ও প্রাণের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতার উপরেই স্বাধিষ্ঠিত। বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে প্রাণের সাড়া পাই। বৈষ্ণব কবিদিগের শ্রীকৃষ্ণ কাল্পনিক নহে। বৈষ্ণবের রাধা তাঁহাদের জীবনের প্রাণের মর্ম্মের শতদলের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।"

চিত্তরঞ্জন বৈষ্ণব কবির পদাবলীতে যে প্রাণের সাড়া পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বিরাট ত্যাগে মূর্ত্ত হইয়াছিল। যে সাড়া বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডিদাসের—

"পুত্র পরিজন সংসার আপন,
সকল ত্যজিয়া লেথ—"

পদমধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেই সাড়া চিত্তরঞ্জনের ভাবপ্রবণ উদার হৃদয়ের উন্মুক্ত দ্বারের মধ্য দিয়া অন্তস্তলে পৌঁছিয়াছিল।

প্রেমের কবি চণ্ডিদাস গাহিয়াছেন :—

"পিরীতি নগরে বসতি করিব
পিরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতি দেখিয়া পড়শী করিব
তা বিনু সকল পর॥
পিরীতি দ্বারের কবাট করিব
পিরীতে বাঁধিব চাল।
পিরীতি আসকে সদাই থাকিব
পিরীতে গোঙাব কাল॥
পিরীতি-পালঙ্কে শয়ন করিব
পিরীতি শিথান মাথে।

পিরীতি-বালিসে আলিস ত্যজিব
থাকিব পিরীতি সাথে ॥
পিরীতি-সরসে সিনান করিব
পিরীতি অঞ্জন লব।
পিরীতি ধরম পিরীতি করম
পিরীতে পরাণ দিব ॥
পিরীতি নাসার বেশর করিব
দুলিবে নয়ন-কোণে।
পিরীতি অঞ্জন লোচনে পরিব
দ্বিজ চণ্ডিদাস ভণে॥"

এ প্রেম-তন্ময়তা না হইলে প্রিয়কে পাওয়া যায় না। সে তন্ময়তা পাওয়া কি সহজ কথা? তাই চণ্ডিদাস নিজেই সে কথা তুলিয়াছেন :—

"পিরীতি পিরীতি সব জন কহে
পিরীতি সহজ কথা?
বিরিখের ফল নহে ত পিরীতি
নাহি মিলে যথা তথা ॥
পিরীতি অন্তরে পিরীতি মন্তরে
পিরীতি সাধিল যে।
পিরীতি রতন লভিল সে জন
বড় ভাগ্যবান্ সে ॥
পিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন করিতে পারিলে
পিরীতি মিলয়ে তারে ॥"

বস্তুতঃ 'আপনা ভুলিতে' না পারিলে—পরেতে মিশিয়া পরকে আপন করিতে না পারিলে 'পিরীতি' মুখের কথাই বটে। সে ত্যাগ, সে বৈরাগ্য কয়জন ভাগ্যধরের ভাগ্যে ঘটে? সে প্রেম-তন্ময়তা হৃদয়ে জাগিলে জগতের সুখ, দুঃখ, সম্পদ, বিপদ, সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্য তুচ্ছ জ্ঞান হয়। সাধক বৈষ্ণব কবি ভগবৎ-প্রেমে তন্ময়তা লাভ করিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন তাঁহাদেরই প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইয়া, তাঁহাদেরই ভাবের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া "অন্তর্যামীতে" গাহিয়াছেন :—

"এস মনোবনবাসে এস বনমালি!
চরণতলে ফোটা ফুল তারি বরণডালি!
সাজায়ে রেখেছি আজ নয়ন-জলে ধুয়ে
পরাণ ভ'রে প্রাণ জুড়াব তোমার পায়ে শুয়ে।
তোমার পায়ে ফোটা ফুল কাঁটা নাহি তায়
কত না আনন্দে মোর হৃদয়ে লুটায়।
এস মনোব্রজবাসে এস বনমালি!
তোমার ফুলে সাজায়েছি তোমার বরণডালি॥"

কিন্তু ইহাতেও—এই প্রাণ ভরিয়া পূজাতেও যেন তাঁহার প্রাণ তৃপ্ত হয় নাই, তাই তিনি গুরু বৈষ্ণব কবির মত প্রিয়জনে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়াছেন :—

"আমার পরাণ ভরি উঠে যত গান
তোমার পরাণ হ'তে পায় যেন প্রাণ।
আমারে ভাসায়ে রাখ পরাণ পরশে
আমারে ডুবায়ে দাও পরশ হরষে॥"

চিত্তরঞ্জনের ভাবপ্রবণ মন এই ভাবেই গঠিত হইয়াছিল। এমন তৈয়ারী জমীতে যে গাছেরই বীজ ছড়ান হউক না, উহাতে সুফল ফলিবেই। তাই চিত্তরঞ্জনের আবাল্য-পোষিত স্বদেশ-প্রেমের বীজ স্বদেশী সাধনায় অঙ্কুরে ও পরে পত্রপুষ্প-ফলভারে অবনত বৃহৎ মহীরুহে পরিণত হইয়াছে।

ইহারই জন্য তিনি আপনাকে ভুলিতে পারিয়াছেন, সংসার ও পুত্র-পরিজনকে ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন—দেশের মঙ্গল-সাধনায় উৎসর্গ করিতে পারিয়াছেন, মায়ামোহের ডোর কাটিয়া দেশসেবার কণ্টক-বহুল কঠোর পথে অনায়াসে অগ্রসর হইয়াছেন। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই—তবে আমরা স্বার্থান্ধ ক্ষুদ্র জীব এই ত্যাগের "দৃপ্ত যেন হুতাশন" মূর্ত্তি দেখিয়া অসম্ভব মনে করিয়া বিস্ময়ে পুলকে কণ্টকিত হইতেছি মাত্র!

মহাত্মা গন্ধীর প্রভাব

সর্ব্বশেষে আর একটি প্রভাবের উল্লেখ করিব। বুঝিয়াছেন কি পাঠক, এ প্রভাব কাহার? এ প্রভাব যুগাবতার মহাত্মা গন্ধীর। নবভারতের মুক্তিমন্ত্রের গুরু যে অমর সাধনার বাণী প্রচার করিতে আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই বাণী স্বদেশপ্রেমিক চিত্তরঞ্জনের ভাব-প্রবণ হৃদয়ে কি ঘাত-প্রতিঘাত করিয়াছে, তাহা বাঙ্গালীর অবিদিত নহে। একবার চিত্তরঞ্জনের -হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার-কেশরী চিত্তরঞ্জনের- ধনী বিলাসী চিত্তরঞ্জনের পূর্ব্বজীবনের কথা স্মরণ করুন, আর দেশ-প্রেমে সর্ব্বত্যাগী চিত্তরঞ্জনের জীবনটির তুলনায় সমালোচনা করুন, তাহা হইলেই বুঝিবেন, চিত্তরঞ্জনের জীবনে ত্যাগী সন্ন্যাসী গন্ধীর কি অসাধারণ প্রভাব!

কলিকাতায় ১৯২০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে যখন জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক অনুষ্ঠান ন্যাশানাল কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয়, তখনও চিত্তরঞ্জন বর্ত্তমান ইংরেজ আমলাতন্ত্র-শাসনের সহিত সহযোগিতা-সাধন করিয়া দেশের মুক্তিসাধনায় পূর্ণ আস্থাবান্। তিনি সেই বিশেষ অধিবেশনে মহাত্মা গন্ধীর প্রস্তাবিত অহিংস অসহযোগ প্রস্তাবের সমর্থন করেন নাই, বরং সভাপতি লালা লজপৎ রায়ের মত প্রতিবাদই করিয়াছিলেন।

নাগপুরে যখন কংগ্রেস বসিল, তখন চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালা হইতে 'দলে

ভারি' হইয়া অর্থাৎ বহুসংখ্যক প্রতিনিধি লইয়া নাগপুরে যাইবেন এবং মহাত্মা গন্ধীর প্রস্তাব নাকচ করিয়া দিবেন, এইরূপ কথা উঠিয়াছিল। এমন কি, তখন জনরব শতজিহ্বা বিস্তার করিয়া বলিয়াছিল, চিত্তরঞ্জন "ভাড়াটিয়া গুণ্ডা" লইয়া গিয়া নাগপুরের গন্ধী-যজ্ঞ পণ্ড করিয়া দিবেন। এ সকল জনরবে তখন বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর উপর অন্যান্য প্রদেশের মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

চিত্তরঞ্জনের পরিবর্ত্তনের ক্রমবিকাশ

কলিকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মহাত্মা গন্ধী সহযোগিতা-বর্জ্জননীতিকে পঞ্জাব ও খেলাফৎ অনাচারের একমাত্র প্রতিবাদের পন্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার প্রস্তাব এইরূপ ছিল :—

(১) পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন-নীতিতে ও অসহযোগমন্ত্রে দেশবাসীকে সম্যক্ শিক্ষিত করিয়া তোলা।

(২) জাতীয় শিক্ষানুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করা।

(৩) সালিশী বিচারালয়ের প্রতিষ্ঠা করা।

(৪) সরকারের সংশ্রব-সম্পর্কিত স্কুল-কলেজ ও আদালতাদি বর্জ্জন করা।

(৫) সরকারী খেতাব ও অবৈতনিক চাকুরী বর্জ্জন করা।

(৬) সরকারী লেভি ও দরবার আদির সহিত সম্পর্ক বর্জ্জন করা।

(৭) শ্রমিক সঙ্ঘ গঠন করিয়া এক বিরাট ট্রেড় য়ুনিয়ানে কেন্দ্রীভূত করা।

(৮) ক্রমশঃ অবস্থা বুঝিয়া বিদেশী ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায় হইতে দেশীয় মূলধন ও শ্রমিকগণকে ছাড়াইয়া লওয়া।

(৯) ভারতের বাহিরে সৈনিক, লেখক ও শ্রমিক হিসাবে কোনও ভারতীয় কাজ না করে, তাহার ব্যবস্থা করা।

(১০) স্বদেশী সাধনা করা।

(১১) এই জাতীয় আন্দোলনের সফলতা-সাধনের নিমিত্ত অর্থসংগ্রহার্থ একটি স্বরাজ-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করা।

অসহযোগের ইতিহাস

এই অসহযোগ-নীতি কেন মহাত্মা গন্ধী প্রবর্ত্তিত করেন, তাহার একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই স্থানে না দিলে ব্যাপারটা খোলসা হইবে না। জর্ম্মণ-যুদ্ধে মহাত্মা গন্ধী ইংরেজরাজের পক্ষাবলম্বন করিয়া ইংরেজকে অনেক সাহায্য করেন। ইহার কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন, ইংরেজের এই জর্ম্মণ-যুদ্ধ ন্যায়-যুদ্ধ, ধর্ম্ম-যুদ্ধ। ইংরেজ, জর্ম্মণ-স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন, জর্ম্মণ-সামরিক আত্মম্ভরিতা এবং প্রবল জর্ম্মণের অন্যান্য দুর্ব্বল জাতি-দলনের ইচ্ছা প্রতিহত করিবার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছেন, মহাত্মা গন্ধীর ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস। তাই তিনি এ দেশে সেনা-সংগ্রহে ইংরেজকে সাধ্যমত সাহায্য করিয়াছিলেন। কেবল সেনা-সংগ্রহ নহে—অর্থ ও রণসম্ভার সংগ্রহেও ইংরেজ সরকার তাঁহার নিকট প্রভূত সাহায্য লাভ করিয়া-ছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে বুয়র-যুদ্ধের সময়ও মহাত্মা গন্ধী অর্থে সামর্থ্যে ইংরে-জের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন,—ভারতীয় ডুলিবাহক দল গঠন করিয়া স্বয়ং তাহার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। অথচ আশ্চর্য্যের কথা, সে সময়ে দক্ষিণ-আফ্রিকার ইংরেজ উপনিবেশ সরকার প্রবাসী ভারতীয়ের উপর—বিশেষতঃ তাঁহার উপর অনাচার-অত্যাচার আচরণ করিতেছিলেন! কিন্তু মহাত্মা গন্ধী তখনও ইংরেজের ঔদার্য্যে বা স্বাধীনতা-প্রিয়তায় আস্থা-হীন হন নাই। তিনি জানিতেন, ইংরেজ এখন না বুঝিলেও দুই দিন পরে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলে ভারতীয়ের প্রতি অন্যায় ব্যবহার উঠা-ইয়া দিবেন।

হিংসা নহে—প্রেম

চিত্তরঞ্জনের এ বিষয়ে মনের ভাবটি ঠিক মহাত্মা গন্ধীর অনুরূপ। তাঁহার ন্যায় স্বদেশপ্রেমিক বিরল। জননী জন্মভূমির দাসত্বের বন্ধন মুক্ত

করিবার আকুল আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে অনুক্ষণই জাগরূক। কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি জন্মভূমির মুক্তি অর্থে ইংরেজের বহিষ্কার বুঝেন না— ইংরেজ জাতির প্রতি বা ইংরেজ শাসনের প্রতি তাঁহার কোনও বিদ্বেষ নাই। তাঁহার ক্রোধ বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর উপর—Bureaucracyর উপর। এই জন্য তিনি কোনও বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—

"When I ask for Home rule or Self-Government, I am not asking for another Bureaucracy. In my opinion Bureaucracy is Bureaucracy, be that Bureacracy of Englishmen, or of Anglo-Indians or of indians, অর্থাৎ যখন আমি স্বায়ত্তশাসন চাহি, তখন মনে করিবেন না যে, আমি বর্ত্তমান আমলাতন্ত্র-শাসনের পরিবর্ত্তে আর একটা নূতন আমলাতন্ত্রশাসন চাহিতেছি। আমার মতে আমলাতন্ত্র-শাসন সবই সমান, তা সে ইংরেজেরই হউক বা ফিরিঙ্গীরই হউক অথবা ভারতীয়েরই হউক।"

চিত্তরঞ্জনের নিকট ইংরেজ ভারতীয় নাই, শাসনটা জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেই হইল। তাই চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন :—

"If the Anglo-Indians want to make India their home, let them do so and we will work hand in hand with them in the interests of the Indian Empire. But if they come here to make money and all their interest is how best to make it, I Say they are no friends of India. I say to them—Come here if you want. Make money if you can. Go away in peace if you want to do so."

যদি প্রবাসী ইংরেজরা ভারতকে আপনার আবাসভূমি বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন, তবে সানন্দে বলিব,—আসুন, আমরা একযোগে ভারতের মঙ্গলের জন্য কাজ করি। কিন্তু যদি তাঁহারা এ দেশে কেবল

অর্থোপার্জ্জন করিতেই আসিয়া থাকেন এবং অর্থোপার্জ্জনই যদি তাঁহাদের একমাত্র স্বার্থ হয়, তাহা হইলে বলিব, তাঁহারা ভারতের মিত্র নহেন। আমি তাঁহাদিগকে বলিব,—ইচ্ছা কর, এ দেশে আইস। অর্থোপার্জ্জন করাই যদি বাসনা হয়, অর্থোপার্জ্জনই কর। যদি এ দেশ হইতে যাইতে চাও, তাহা হইলে বলি, যাও, শান্তিতে যাও।"

উপরি-উক্ত কথার ভাবে বুঝিতে বাকি থাকে না যে, চিত্তরঞ্জন ইংরেজের শুভাকাঙ্ক্ষী। তবে দেশের পক্ষে যাহা মঙ্গলকর—দেশের মুক্তির পক্ষে যাহা মঙ্গলকর, তাহা সকলের আগে চিত্তরঞ্জনের প্রিয়। চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন,—"Work for my country is part of my religion. It is part and parcel of all the idealism of my life. I find in the conception of my country the expression also Devinity অর্থাৎ দেশের সেবা আমি আমার ধর্ম্মের অংশ বলিয়া মনে করি। আমার জীবনের স্বপ্নের—আদর্শের ইহা এক অঙ্গ। দেশ বলিতে আমি ভগবান্‌কেও বুঝি।"

এই যে দেশ-প্রেমের উন্মাদনা—ইহা চিত্তরঞ্জনেরও যেমন অস্থিমজ্জাগত, তেমনই মহাত্মা গন্ধীরও অস্থিমজ্জাগত; তাই এই দুই kindred spiritএর এত মিল! মহাত্মা গন্ধীও চিত্তরঞ্জনের মত সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত, পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত ব্যারিষ্টার, ইংরেজের গুণমুগ্ধ ছিলেন। এই জন্য জর্ম্মণ-যুদ্ধ পর্য্যন্ত—দক্ষিণ-আফ্রিকায় নির্য্যাতিত হইয়াও ইংরেজের বন্ধুতা করিয়া আসিয়াছিলেন, ইংরেজকে ঘোর বিপদের দিনে সাধ্যমত সাহায্যদান করিয়াছিলেন।

রাউলাট আইন

কিন্তু যখনই মহাত্মা গন্ধী দেখিলেন, এ দেশের ইংরেজ আমলাতন্ত্র-শাসক জননী জন্মভূমির ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অমনই তিনি স্বদেশের আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার

নিমিত্ত সিংহবিক্রমে গর্জ্জিয়া উঠিলেন—আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতে সন্ন্যাসী গন্ধীর সত্যাগ্রহ বাণী ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। কেন এ সত্যাগ্রহ? ইহারও একটু ইতিহাস এখানে আবশ্যক। জর্ম্মণ-যুদ্ধের পর ১৯১৯ সালের প্রারম্ভে রাউলাট কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্ব্বে ১৯১৮ সালে সরকার এ দেশে রাজনৈতিক ও অনাচারমূলক ষড়যন্ত্রের বিষয় তদন্ত করিবার নিমিত্ত বিলাতের কিংস বেঞ্চ ডিভিসনের মিঃ জষ্টিশ রাউলাটের নেতৃত্বে এক কমিটী নিযুক্ত করেন, উহা রাউলাট কমিটী নামে প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান বাঙ্গালা-সরকারের এডুকেশন মিনিষ্টার (শিক্ষা-সচিব) মিঃ প্রভাসচন্দ্র মিত্র ঐ কমিটীর একজন সদস্য ছিলেন। যুদ্ধাবসানে ভারতরক্ষা আইনের Defence of India Act বিলোপ-সাধন করিতে হইবে, অথচ উহা বিলুপ্ত হইলে, রাজদ্রোহিগণকে আটক রাখা অসম্ভব হইবে, এই আশঙ্কায় সরকার সমগ্র ভারতবাসীর তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও রাউলাট কমিটীর রিপোর্টের সিদ্ধান্ত অনুসারে দুইখানি কঠোর আইন প্রণয়ন করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। সেই দুই আইনের স্বরূপ এই :—

(১) অনাচারমূলক অভিযোগের বিচার শীঘ্র সম্পাদিত হইবে এবং বিচারের বিরুদ্ধে আর আপীল চলিবে না।

(২) প্রকাশ বা প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে কেহ কোনও রাজদ্রোহ-জনক কাগজপত্র রাখিলে দণ্ড পাইবে।

ইহাতে এই হইল যে, সরকার ভারতরক্ষা আইন তুলিয়া দিলেও তাহারই অনুরূপ ক্ষমতা হাতে রাখিবার নিমিত্ত এই আইন প্রণয়ন করিতে উদ্যত হইলেন। ভারতরক্ষা আইন সাময়িক—যুদ্ধের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত উহার প্রাণ ছিল। কিন্তু এই রাউলাট আইন ভারতের আইনের কেতাবে অজর অমর হইয়া রহিবে,—ইহাতে ভারতবাসীর যদি আপত্তি না হইবে, তবে কিসে হইবে? মনে করুন, ইহাতে সরকার এদেশবাসীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় কি ভাবে হাত দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। এই

শ্রীমতী বাসন্তী দেবী।

আইনের বলে ভারতের বড়লাট ও তাঁহার কাউন্সিল ইচ্ছা করিলে বৃটিশ ভারতের যে কোনও স্থানে যে কোনও সময়ের জন্ত ভারতরক্ষা আইনের ক্ষমতার প্রায় অনুরূপ ক্ষমতা প্রাদেশিক গভর্ণরগণের হস্তে ন্যস্ত করিতে পারিবেন—ফলে যে কোনও ব্যক্তিকে ইচ্ছা করিলে সরকার বিনা বিচারে আটক করিয়া রাখিবার ক্ষমতা হস্তগত করিবেন। ইহা হইল প্রথম রাউলাট আইন। অপরটির দ্বারা ভারতীয় ফৌজদারী আইনের বন্ধন আরও দৃঢ় করিবাঁর উপায় করা হইল।

গন্ধীর সত্যাগ্রহ

এ ভয়ঙ্কর বন্ধনের বিপক্ষে সমগ্র ভারতে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না,—আইন পাশ হইয়া গেল। কেবল দ্বিতীয় আইনটি স্থগিত রহিল। প্রতিবাদস্বরূপ মাদ্রাজের বি, এন, শর্ম্মা ব্যবস্থাপক সভার পদত্যাগ করিলেন, কিন্তু পরদিন বড়লাটের গৃহে ভোজে গিয়া লাটের অনুরোধে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করেন। কিন্তু ইহার পর সদস্যদিগের মধ্যে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, জিন্না, মজরুল হক ও বিষণদত্ত শুক্ল পদত্যাগ করেন।"

এ ঘটনা ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের। ঐ ফেব্রুয়ারী মাসে মহাত্মা গন্ধী প্রচার করিলেন, রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে ভারতবাসী 'সত্যাগ্রহ' অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিবে। ইহারই নাম Passive resistance বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। এই অস্ত্রে মহাত্মা গন্ধী দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়ের যুদ্ধ জয় করিয়াছিলেন।

১লা মার্চ্চ মহাত্মার ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল। উহার কথাগুলি স্মরণযোগ্য :—

"রাউলাট আইন স্বাধীনতা ও ন্যায়ের বিরোধী। উহা মানুষের সহজাত অধিকারের হন্তারক। যে অধিকারের উপর রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ

নির্ভর করে, রাউলাট আইন উহার ধ্বংসকারক হইবে। এই হেতু আমরা ভারতবাসীরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, এই দুই আইন বিধিবদ্ধ হইলে তাহার প্রত্যাহার না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা উহা নিরুপদ্রবে অমান্য করিব। পরন্ত আমাদের নিযুক্ত কমিটীর নির্দ্দেশানুসারে অন্যান্য আইনও ভদ্রভাবে অমান্য করিব।"

চিত্তরঞ্জনের সাড়া

আইন পাশ হইলে পর প্রথম রবিবার মহাত্মা গন্ধীর সত্যাগ্রহ ব্রত আরম্ভ হইল। ঐ দিন ভারতের জনসাধারণ স্নান ও উপবাস করিয়া ভগবানের উপাসনা করিল এবং কাজকর্ম্ম বন্ধ করিল। দেশপ্রেমিক ভাবুক চিত্তরঞ্জন ইহাতে কি সাড়া না দিয়া থাকিতে পারেন? কলিকাতার গড়ের মাঠে ১৩২৭ সালের ২৩শে চৈত্র যে বিরাট সত্যাগ্রহ সম্মেলন হইল, উহা যে দেখিয়াছে, সে এখনও তথায় চিত্তরঞ্জনের প্রাণোন্মাদিনী বক্তৃতার কথা স্মরণ করিবে :—

"আজ মহাত্মা করমচাঁদ গন্ধীর দিন। আজ বাঙ্গালীর হৃদয়ের বেদনা প্রকাশ করিবার দিন। আনন্দের দিনে আমরা আত্মহারা হইয়া যাই; কিন্তু দুঃখের দিনে আপনাকে দেখিতে পাই ও ভগবানের বাণী শুনিতে পাই।

"আজি এই জাতির বিপদের দিনে এই জাতির যে, তাহাকেই অনুসন্ধান করিব। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' কিন্তু এই বল কিসের বল? পাশব বলে আত্মাকে পাইব না। এই বল প্রেমের বল। ইহাই মহাত্মার বাণী, আর ইহাই সমগ্র ভারতের বাণী। এই বাণীকে সার্থক করিতে হইলে সকল স্বার্থপরতাকে, সকল হিংসা-ঘৃণা-বিদ্বেষকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

"আমরা রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে কেন আন্দোলন করি? আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, রাউলাট আইন চলিলে আমাদের এই নবজাগ্রত

জাতিটাকে তাহার নিজের পথ ধরিয়া গড়িয়া তুলিতে বাধা প্রাপ্ত হইব। সেই বাধা অতিক্রম করিতে হইলে সকল দ্বেষ-হিংসা বর্জ্জন করিয়া দেশ-প্রেমকে জাগাইতে হইবে। তাই মহাত্মা গন্ধী বলিয়াছেন, শত্রুকে ঘৃণা-হিংসা করিবে না, কারণ, প্রেমেই শত্রুকে জয় করা যায়।"

সত্যাগ্রহ ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ফল

এই সময় হইতেই গন্ধীর প্রভাব চিত্তরঞ্জনে স্বপ্রকাশ করিতে থাকে। সত্যাগ্রহের ফলে ১৯১৯ সালের ৩০শে মার্চ্চ তারিখে দিল্লীতে রক্তপাত হইল। এই দিল্লীতে ১৯১৮ সালে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, উহাতে চিত্তরঞ্জন, :মিসেস্ বেসাণ্ট, ডাক্তার কিচলু প্রভৃতির সহিত এক সুরে আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রস্তাবের সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। বিধিলিপি এমনই যে ঠিক,উহার পর-বৎসরে মহাত্মা গন্ধীর 'সত্যাগ্রহ' ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষে দেশবাসী আত্মনিয়ন্ত্রণ মন্ত্রের সার্থকতা-সম্পাদনে উদ্যোগী হইল। সহরবাসী একযোগে কাজকর্ম্ম বন্ধ করে। কিন্তু রেলষ্টেশনে মিষ্টান্ন-বিক্রেতা মিষ্টান্ন বিক্রয় করিতে বিরত হয় নাই বলিয়া গোলযোগ হয়; উহা হইতেই নাকি হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়। মহাত্মা গন্ধী হাঙ্গামা ও রক্তপাতের সংবাদ পাইয়া দিল্লীযাত্রা করেন। পথে পুলিশ তাঁহাকে বাধা দিয়া প্রথমে মথুরায় লইয়া যায়। পরে বোম্বাই বিভাগের সীমা•ার মধ্যে থাকিবার জন্য সরকার তাঁহার উপর আদেশ দেন। ইহার ফলে পঞ্জাবে যে আগুন জ্বলিয়া উঠে, তাহার দীপ্ত শিখা আজিও সমান তেজে জ্বলিতেছে। পঞ্জাব-হাঙ্গামা ও অনাচারের কথা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। জালিয়ানওয়ালাবাগে ডায়ারের নৃশংসতা; জনসন, ওব্রায়েন, বসওয়ার্থ স্মিথ প্রভৃতির অমানুষিক অনাচার, ওডয়ারের মিলিটারী শাসন, হাণ্টার কমিটী নিয়োগ প্রভৃতির পুনরাবৃত্তি করিয়া অকারণ গ্রন্থকলেবর বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই। ইহার মধ্যে এইটুকু লক্ষ্য করিলেই যথেষ্ট হইবে যে, দেশবাসীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক সম্মেলন কংগ্রেস পঞ্জাব

অত্যাচারের প্রকৃত তদন্তের জন্য যে কমিটীর নিয়োগ করিয়াছিলেন, চিত্ত-রঞ্জন তন্মধ্যে অন্যতম সদস্যরূপে প্রভূত অসুবিধা ও ক্ষতি স্বীকার করিয়াও দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ঐ কমিটীতে থাকিয়া স্বচক্ষে ঘটনাস্থল সমূহ পরিদর্শন করিয়া ও স্বকর্ণে নিপীড়িত লাঞ্ছিতগণের সাক্ষ্য শুনিয়া তাঁহার মনে পঞ্জাবের স্মৃতির একটা দাগ লাগিয়া গিয়াছিল—সে দাগ ইহজন্মে যাইবার নহে। রাউলাট আইন বিধিবদ্ধ হওয়াতে চিত্তরঞ্জনের মনে অসহযোগের জমী প্রস্তুত হইয়াছিল, আবার কংগ্রেসের বে-সরকারী তদন্ত-সমিতিতে থাকিয়া সেই জমীতে বীজ উপ্ত ও অঙ্কুর উদ্গত হইল।

অসহযোগ গ্রহণ ও বাঙ্গালায় নেতৃত্ব

এ অবস্থায় চিত্তরঞ্জন প্রথমে কলিকাতার বিশেষ কংগ্রেসে অসহ-যোগের বিরুদ্ধবাদী হইলেও, নাগপুরের কংগ্রেসে মহাত্মা গন্ধীর যুক্তি-তর্কে যে অসহযোগের পরম পক্ষপাতী হইয়া উঠিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। কলিকাতার কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন সরকারী স্কুল-কালেজ বর্জ্জন ও আদালত-বর্জ্জনের বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু কয়েকমাস পরেই (ডিসেম্বর মাসে) নাগপুরের কংগ্রেসের অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন যেন নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেশের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। মহাত্মা গন্ধীর সহিত অসহযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া যখন তিনি বুঝিলেন, অসহযোগ ভিন্ন এ দেশের অবস্থা প্রতীকারের আর উপায় নাই, তখন তিনি সম্পূর্ণ অসহযোগী হইলেন। তাঁহার কাছে Half measures বা আধা-খিচুড়ী কাজ কেহ প্রত্যাশা করে নাই যাহা তিনি অন্যায় বা অসত্য বলিয়া একবার বুঝিবেন, তাহা বিষবৎ বর্জ্জন করিবেন, এইরূপই প্রকৃতি তাঁহার। তাই তিনি যখন মহাত্মার যুক্তিতর্কে বুঝিলেন, অহিংস অসহযোগ ভিন্ন উপায় নাই, তখনই

তিনি স্বয়ং নাগপুর কংগ্রেসে অহিংস অসহযোগ মন্তব্য উপস্থাপিত করিলেন। ইহাতে মহাত্মা গন্ধীর অদ্ভুত প্রভাব যেমন সপ্রমাণ হয়, তেমনই চিত্তরঞ্জনের ন্যায় ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। চিত্তরঞ্জন অন্য অনেকের মত কেবল মুখের কথায় অসহযোগ অবলম্বন করেন নাই, তিনি কাজেও—নিজের জীবনেও সেই মন্ত্রের উপাসক হইয়া, বিপুল অর্থাগমের পন্থা বিসর্জ্জন দিয়া দেশের কাজে সন্ন্যাসী সাজিয়াছেন, আর সেই গুণে আজ বাঙ্গালীর হৃদয়-সিংহাসনে রাজা হইয়া বসিয়াছেন।

বরিশাল কন্‌ফারেন্স

বরিশালের প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে সভাপতি বিপিনচন্দ্র পাল যখন অসহযোগের বিপক্ষে কূট যুক্তিতর্ক উদ্ধৃত করিয়া ও স্বরাজ শব্দের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া "বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য" রক্ষা করিতে বাঙ্গালীকে উদ্বুদ্ধ করিতেছিলেন এবং বাঙ্গালী কোন dictator (মহাত্মা গন্ধী) মানিবে না বলিয়া তারস্বরে ঘোষণা করিতেছিলেন, সেই সময়ে চিত্তরঞ্জন সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্বরাজ, অসহযোগ ও মহাত্মা গন্ধীর সমর্থনে যে প্রাণস্পর্শিনী বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা আজিও লোকের কর্ণে যেন ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতেছে। চিত্তরঞ্জনের স্বরাজের ব্যাখ্যা সযত্নে কণ্ঠে ধারণ করিবার যোগ্য, সে ব্যাখ্যা পরে উদ্ধৃত করিব। তবে এইটুকু এখানে বলিয়া রাখি যে, সে দিন বরিশালে বাঙ্গালী চিত্তরঞ্জনের যে শক্তির পরিচয় পাইয়াছিল, বুঝি বরিশালের অন্যতম জন-নায়ক বাগ্মী শরৎকুমার ব্যতীত অপর কেহই সে সভায় সে পরিচয় দিতে পারেন নাই।

গুরু গন্ধী

চিত্তরঞ্জন যে ভাবের ভাবুক হইয়াছিলেন, যে রসের রসিক হইয়াছিলেন,

তাহাতেই তন্ময় হইয়াছিলেন। যখন তিনি মহাত্মা গন্ধীর ভাবে অনুপ্রাণিত হইলেন, তখন তাঁহার প্রাণে যে ভাব-মন্দাকিনীর পুণ্য প্রবাহ বহিয়াছিল, তাহা তাঁহার স্বার্থপরতা ও ভোগবিলাসকে মত্ত মাতঙ্গের মত ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। ধন্য গুরু, সার্থক শিষ্য! একলব্য গুরু দ্রোণকে করাঙ্গুলি উপহার দিয়াছিল। চিত্তরঞ্জন গুরু গন্ধীকে তাহার অপেক্ষাও বড় স্বার্থ-বলি উপহার দিয়াছেন, বলিয়াছেন :—

আমি নিয়েছি দাঁড়, তুলেছি পাল,
তুমি এখন ধর গো হাল,
ওগো কর্ণধার—
আমার মরণ বাঁচন, ঢেউয়ের নাচন,
ভাবনা কি বা কার,
তোমারে করি নমস্কার!
আমি সহায় খুঁজে পরের দ্বারে,
ফিরবো না আর বারে বারে
ওগো কর্ণধার—
কেবল তুমিই আছ, আমিই আছি,
এই জেনেছি সার,
তোমারে করি নমস্কার!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মানুষটাকে বুঝিতে পারিলে মানুষের জীবনের ঘটনাগুলি বুঝিতে কষ্ট পাইতে হয় না। এই জন্য চিত্তরঞ্জনকে বুঝাইবার যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি। এইবার তাঁহার জীবন-কথার আলোচনা করিব। অবশ্য, মানুষের জীবিতকালে মানুষের জীবনের কথা পূর্ণভাবে আলোচনা করা অসম্ভব, কোনও কোনও ক্ষেত্রে কর্ত্তব্যও নহে। বিশেষতঃ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে জীবন-কথা সবিস্তারে আলোচনা করাও এ রচনার উদ্দেশ্য নহে। এই হেতু যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে দেশবন্ধুর জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিব।

বাল্য ও যৌবন

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিক্রমপুর দেশবন্ধুর পিতৃপিতামহের আদিম নিবাস হইলেও চিত্তরঞ্জনের জন্ম হইয়াছিল ১২৭৭ সালের ২০শে কার্ত্তিক কলিকাতার পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটে ভুবনমোহনের বাসাবাটীতে। চিত্তরঞ্জনের জন্মের কয়েক বৎসর পরে ভুবনমোহন ভবানীপুরে উঠিয়া যান। বাল্যে ভবানীপুরেই চিত্তরঞ্জনের শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হয়। তিনি ভবানীপুরের লণ্ডন মিশনারী স্কুলে পাঠাভ্যাস করেন এবং তথা হইতেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রবেশিকায় পাশ হইয়া তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কালেজে প্রবেশ করেন এবং তথা হইতে এফ, এ, ও বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। যে বৎসর (১৮৯০ সাল) তিনি বি, এ, ডিগ্রী প্রাপ্ত হন, সে বৎসর তাঁহার অনার্সে পাশ হইবার কথা। কিন্তু অতি অল্প মার্কের অভাবে তিনি অনার্স পান নাই বলিয়া তাঁহার মনে বড় কষ্ট হইয়াছিল। কালেজে পাঠাভ্যাসকালেই তিনি সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন

এবং রচনায় ও বক্তৃতায় ছাত্রবর্গের মধ্যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে তাঁহার অনার্স বিভাগে নাম না থাকায় তিনি নিজেও যেমন ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, তেমনই তাঁহার বন্ধুবর্গও বিস্মিত হইয়াছিলেন।

বিলাতে শিক্ষা

বি, এ, পাশ করার পর চিত্তরঞ্জনের পিতা তাঁহাকে সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত হইবার জন্য বিলাতে প্রেরণ করেন। তখনকার দিনে ইহাই বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সন্তানের মক্কাতীর্থ বা কাশীতীর্থস্বরূপ ছিল। পুত্র সিভিল সার্ব্ভ্যাণ্ট হইতে পারিলে জীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত হইল, এমনই একটা ধারণা বাঙ্গালী পিতার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে লোকের মুখে রটিত—

"লেখা-পড়া করে যে
গাড়ী-ঘোড়া চড়ে সে ॥"

অর্থাৎ লেখাপড়ার চরম উদ্দেশ্যই ছিল অর্থ উপার্জ্জন করা, বড় চাকুরে হওয়া, গাড়ী-ঘোড়া চড়া। কিন্তু এ 'চাকুরে' লেখা-পড়া—এ অর্থকরী বিদ্যার পরিণতি কোথায়, তাহা বাঙ্গালী পিতামাতা ভাবিয়া দেখিতেন কি না সন্দেহ। সেকালের ঠানদি বা পিসীরা আশীর্ব্বাদ করিতেন,—"বাবা, দারোগা হও।" ইহার বাড়া আশীর্ব্বাদ তাঁহারা করিতে জানিতেন না। অর্থাৎ ছেলে লেখাপড়া শিখিয়া চাকুরী করিবে,—ইহাই ছিল ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইবার উদ্দেশ্য। কেরাণীগিরী, দারোগাগিরী,—বড় জোর হাকিমী, জজিয়তী, ওকালতী, ডাক্তারী। সকলের চেয়ে চরম বিলাতে গিয়া সিভিল সার্ব্ভ্যাণ্ট হইয়া আসা। সকল পেশারই গোড়ার কথা—অর্থ উপার্জ্জন করা, মানুষ হওয়া নহে। কিসে ছেলে মানুষের মত মানুষ হইতে পারে, দেশের সেবা দশের সেবা করিতে পারে, দেশের ধনাগম সম্বন্ধে নিত্য নূতন চিন্তার পথ আবিষ্কার করিতে পারে,

অথবা জগতের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য এবং মৌলিক গবেষণার দ্বারা শত সহস্র লোকের জীবিকার্জ্জনের পথ আবিষ্কারের জন্য লেখাপড়ার সদ্ব্যবহার করিতে পারে, স্বাবলম্বী ও আত্মশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, জাতির ও জগতের ঐহিক ও পারত্রিক মুক্তির পথ সন্ধান করিতে পারে,—এ সকল চিন্তা বাঙ্গালী মাতা-পিতার মনে স্থান পাইত কি না সন্দেহ। রসরসিক-প্রধান নাট্যকার অমৃতলাল বসু একদিন বলিয়াছিলেন, "আমরা ছেলেপুলেকে লেখাপড়া শিখাই, এ কথায় সন্দেহ নাই। কেন না, ছেলেরা লিখিতেও শিখে, পড়িতেও শিখে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত—বিদ্যা শিখে না, মানুষ হয় না।" গোলামীর মোহ বাঙ্গালীর এমনই অস্থি-মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল যে, হয় ত উহারই ফলে চিত্তরঞ্জন সিভিলিয়ান 'সাহেব' হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিতে পারিতেন। তাঁহার পিতা সেই উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। তাহা পূর্ণ হইলে হয় ত বাঙ্গালার জাতীয় জাগরণের ইতিহাস ভিন্নাকার ধারণ করিত। কিন্তু বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর বড় সৌভাগ্যে সে উদ্দেশ্য সফল হয় নাই, চিত্তরঞ্জন চাকুরে "সিভিলিয়ান সাহেব" হইয়া আসেন নাই, স্বাধীন-বৃত্তিজীবী ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছিলেন। এখানেও বিধাতার মঙ্গল-হস্তস্পর্শের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিলাতে শিক্ষার প্রকৃতি

চিত্তরঞ্জন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার বয়স ২১ বৎসর। পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অদ্ভুত বক্তৃতা-শক্তির পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। বিলাতের অনেক সভা-সমিতিতে এই যুবক বাঙ্গালীর অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও বাগ্মিতার পরিচয় সে সময়ে অনেকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেশের প্রেসিডেন্সী কালেজে অধ্যয়নকালে চিত্তরঞ্জন কালেজের Debating clubএ যে প্রতিভার প্রথম পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বিলাতে পরিপুষ্টি লাভ

করিল—যুবক হইলেও চিত্তরঞ্জন তাঁহার রাজনীতিজ্ঞানের এবং ইতিহাস ও সাহিত্যচর্চ্চার সম্যক্ সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার শিক্ষা বিদ্যালয়ের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয় নাই। পাঠ্যপুস্তকের বাহিরে যে একটা প্রকাণ্ড উদার উন্মুক্ত জগতের অস্তিত্ব আছে, চিত্তরঞ্জন শিক্ষা অর্থে তাহা বুঝিয়াছিলেন। আর উহা বুঝিয়াছিলেন বলিয়া প্রাণটি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখেন নাই—আপনার গণ্ডীর বাহিরের বিষয় ও মানুষকে আপনার করিয়া লইতে শিখিয়াছিলেন। ইহাতে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে—ইহাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব বিকসিত হয়। আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষা সেই খাতে পরিচালিত হয় না বলিয়া—আমরা গতানুগতিক খাতে ছেলেদের জীবনের ধারা বাঁধিয়া দিই বলিয়াই কি আমাদের এই অবনতি—এই ধ্বংসের মুখে দ্রুত ধাবন?

রাজনৈতিক বক্তৃতায় দেশ-প্রেম

সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিবার পর চিত্তরঞ্জন দ্বিগুণ উৎসাহে বিলাতের কোনও কোনও রাজনৈতিক সভায় বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। তখনও পরীক্ষার ফল বাহির হয় নাই। সেই সময়ে ভারতীয়ের রাজনীতির অন্যতম শিক্ষাগুরু স্বরাজ মন্ত্রের প্রথম ও প্রধান পুরোহিত দাদা ভাই নৌরজী পার্লামেণ্টে প্রবেশলাভের নিমিত্ত প্রয়াস পাইতেছিলেন। চিত্তরঞ্জন মাতৃযজ্ঞে আহুতি দিবার এমন সুযোগ পরিত্যাগ করিবেন, ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। দেশ-প্রেম যাঁহার অস্থিমজ্জাগত, স্বজাতিপ্রীতি যাঁহার ধ্যান-ধারণা, সেই চিত্তরঞ্জন স্বজাতির ও স্বদেশের গৌরব-রবি দাদাভাইয়ের পক্ষসমর্থন করিবেন, সেই অপরিণত বয়স হইতেই যে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? তিনি বিলাতের নানাস্থানে ইংরেজ নরনারীকে দাদাভাইয়ের নির্ব্বাচনের প্রয়োজনীয়তা জলন্তভাষায় বক্তৃতা করিয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। নবীন বাঙ্গালী যুবকের সেই সকল বক্তৃতা এতদূর

প্রাণস্পর্শিনী হইয়াছিল যে, স্থানীয় বহু শক্তিশালী সংবাদপত্রে ঐ সম্পর্কে চিত্তরঞ্জনের প্রশংসা শতমুখে উচ্চারিত হইয়াছিল। এই বক্তৃতা-সমূহে চিত্তরঞ্জনের অন্তর্নিহিত স্বদেশ-প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া দেখা দিয়াছিল, কালে উহা ফলফুলে মুকুলিত হইয়া বৃহৎ মহীরুহে পরিণত হইয়াছিল।

ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা

কিন্তু চিত্তরঞ্জন একদিকে যেমন সেই অল্প বয়সেই খ্যাতি অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন, তেমনই অন্যদিকে তাঁহার অকৃতিত্বের পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠে। চিত্তরঞ্জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেই পারিলেন না। তাঁহার আত্মীয়স্বজন অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। হইবার কারণও যে ছিল না, এমন নহে। দেশে চিত্তরঞ্জনের সংসারে অর্থের অনাটন—উপরন্তু ভুবনমোহন ঋণজালে বিজড়িত ; সুতরাং আত্মীয়স্বজন আশা করিয়াছিলেন, চিত্তরঞ্জন সিভিল সার্ব্বিস পাশ হইলে সংসারের কষ্ট ঘুচিবে। কিন্তু সে আশায় তাঁহাদিগকে নিরাশ হইতে হইল। নদীর একটি কূল ভাঙ্গে, অপর কূল ভরে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। যাহা চিত্তরঞ্জনের আত্মীয়স্বজনের দুঃখের কারণ হইল,তাহাই আবার চিত্তরঞ্জনের দেশবাসীর সুখের সোপান হইল। চিত্তরঞ্জন দাসত্বের পথে পা বাড়াইয়া ফিরিয়া আসিলেন, ইহাতে তাঁহার সংসারের আপাততঃ দুঃখ ঘুচিল না, কিন্তু দেশ তাঁহাকে পাইবার সুযোগ পাইল। চিত্তরঞ্জন স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের জন্য ব্যারিষ্টারী পড়া স্থির করিলেন। ইহাতে তিনি কৃতকার্য্যও হইলেন, সসম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে দেশে ফিরিলেন। ঐ বৎসরেই তিনি কলিকাতার হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন।

চিত্তরঞ্জন দেশেরই চিত্তরঞ্জন

চিত্তরঞ্জন যে সময়ে বিলাতে যান এবং ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া

আসেন, সে সময়ে এ দেশের লোক প্রায়শঃ বিলাতে গেলে 'সাহেব' সাজিয়া দেশে ফিরিত। তাহারা দেশী ভাষা, দেশী পোষাক, দেশী আচার, দেশী আদবকায়দা, দেশী মানুষ কিছুই ভালবাসিত না। এক কথায় তাহারা পুরাদস্তুর হ্যাটকোটধারী 'নেটিব-দ্বেষী' ইঙ্গবঙ্গরূপ অদ্ভুত জীবে পরিণত হইত। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ইহার যে চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন—"আমরা বিলেতফের্ত্তা ক'ভাই"—তাহার তুলনা নাই। তাঁহার সেই "বিলাতী ধরণে কাসি, বিলাতী ধরণে হাসি", আর "পা ফাঁক করিয়া চুরুট টানিতে বড্ডই ভালবাসি" যে পড়িয়াছে, সে-ই ইঙ্গবঙ্গের মর্ম্ম হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়াছে। রসরসিক নাট্যকার অমৃতলাল যাহাদিগকে "কিম্ভূত কিমাকার যেন কিসের মতন। আহা বেঁচে থাক বেঁচে থাক, নব পুরুষরতন ॥" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, তাহারা এই ইঙ্গবঙ্গ সম্প্রদায়েরই একাঙ্গ। বিলাতে থাকিয়া, বিলাতী সমাজে চলাফিরা মিলা-মিশা করিয়া চিত্তরঞ্জন যে বিন্দুমাত্রও ইঙ্গ-বঙ্গ-ভাবাপন্ন হন নাই, এমন কথা আমরা বলিতেছি না। তাঁহার বেশভূষা, হাব-ভাব, চাল-চলন—সেই "পা ফাঁক করিয়া চুরুট টানিতে বড্ডই ভালবাসি"র দলের মত হয় নাই, তাহাও কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না। কেন না, এ দেশে আসিবার পর ব্যারিষ্টারী করিবার কালে চিত্তরঞ্জন মিঃ সি, আর, দাশই হইয়াছিলেন, কোর্টেই কি, আর সভা-সমিতি, কনফারেন্স কমিটী, বা মজলীস মাইফেলেই কি, মিঃ দাশকে হ্যাটকোট সাজে বিলাতী বুলীতে মজগুল হইয়া থাকিতে কে না দেখিয়াছে? কিন্তু তাহা হইলেও সেই বিদেশী আবহাওয়ার মাঝেও মিঃ সি, আর, দাশের মনের এক কোণ হইতে দেশের চিত্তরঞ্জনকে সকল সময়েই দেখা যাইত। দেশের সাহিত্য-সেবায়, দেশের দরিদ্রনারায়ণের সেবায়, দেশের রাজনীতি চর্চ্চায়, দেশের আত্মীয়-কুটুম্ব-পোষণে দেশের চিত্তরঞ্জনের প্রকৃত রূপ মিঃ সি, আর, দাশের মধ্য হইতে যখন তখন ফুটিয়া বাহির হইত। ফল কথা, ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ বিদেশী পোষাক

চিত্তরঞ্জনের বিরাট দেশ-প্রেমিক মনটিকে ঢাকিয়া রাখিতে সমর্থ হয় নাই।

চিত্তরঞ্জন ইঙ্গ-বঙ্গ-সমাজের একজন হইলেও—ইঙ্গবঙ্গের সহিত তাঁহার বেশী মেলামিশা হইলেও চিত্তরঞ্জন কখনও খাঁটি ইঙ্গবঙ্গ হইতে পারেন নাই। তখনকার কালের অধিকাংশ ইঙ্গ-বঙ্গ দেশের সব জিনিসকে nasty দেখিতেন—দেশের সবই খাটো, সবই মলিন, সবই কদর্য্য, ইহাই তাঁহাদের অনেকের ধারণা ছিল। নিজে 'নেটিভ' হইলেও তাঁহারা ইংরেজের মত এ দেশের মানুষকে বা জিনিসকে 'নেটিব' বলিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চন করিতেন। বলা বাহুল্য, দেশের লোকও তাঁহাদের এ এ ঘৃণা সুদ সমেত ফিরাইয়া দিত। তাই স্বদেশীর আমলের নলিনীনাথ (বর্ত্তমান "বিজলী"র নলিনীনাথ সরকার) তাঁহার গানে রচিয়াছিলেন :—

"নতুন সাজে সেজেছি আজ বিলাত-ফেরত আমরা।
ইঙ্গ-বঙ্গ হাম্বারবে যেন শৃঙ্গবিহীন দামড়া॥"

চিত্তরঞ্জন কিন্তু ইঙ্গ-বঙ্গ দলের একজন হইলেও দেশের কোন জিনিসকে ছোট বা খাটো দেখিতেন না,—জন্মভূমির কোনও নিন্দা তাঁহার সহ্য হইত না। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে সেই যুবাবয়সেই চিত্তরঞ্জন তাঁহার দেশ-ভক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। সেই সময়ে—১৮৯২ সালে যখন চিত্তরঞ্জন ইংলণ্ডে অবস্থান করিতেছেন, তখন এক ঘটনা সংঘটিত হয়। উহার পর-বৎসরই চিত্তরঞ্জন দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঐ বৎসরে বৃটিশ পার্লামেণ্ট মহাসভায় জেমস্ ম্যাকলিন নামক কোনও সদস্য বক্তৃতার মুখে ভারতবাসীকে অযথা অভদ্রোচিত আক্রমণ করিয়া গালি দেন, বলেন,—ভারতীয়রা ক্রীতদাসের জাতি, মুসলমানরা দাস এবং হিন্দুরা চুক্তিবদ্ধ দাস; অথবা মুসলমানরা গোলাম, হিন্দুরা গোলামের গোলাম। যুবক চিত্তরঞ্জনের দেশ-প্রেমিক প্রাণ ইহাতে মহা ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইয়া উঠে। এ অপমানের জ্বালা তিনি কখনও বিস্মৃত হন নাই। তিনি

লেখাপড়ার কথা—আইন অধ্যয়নের কথা—জগৎ-সংসারের কথা ভুলিয়া গেলেন। তখন তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য হইল—কিসে অপমানের প্রতিশোধ লইতে পারেন, কিসে জননী জন্মভূমির মুখ রাখিতে পারেন। একটা মিথ্যাবাদী লোক তাহার সাদা চামড়ার জোরে সারা বিশ্বের সম্মুখে তাঁহার স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির সন্তানগণকে গোলাম ও গোলামের গোলাম আখ্যা দিয়া অপমানিত করিল, আর তিনি নীরবে অবনতমস্তকে তাহা সহ্য করিবেন—পাঠ্যপুস্তক ক্রোড়ে লইয়া পরীক্ষার্থে প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত বসিয়া থাকিবেন? দূর হউক এমন পরীক্ষা—ভাসাইয়া দাও এমন পাঠ্যপুস্তক কর্ম্মনাশা-জলে! চিত্তরঞ্জন প্রবাসী ভারতীয়ের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া, তাঁহাদিগের সম্মতি গ্রহণ করিয়া লণ্ডনের এক্সটার হলে এক সভার অধিবেশন করাইলেন। সে সভায় ঐ উদ্ধত অশিষ্ট ম্যাকলিনের কথার তীব্র প্রতিবাদ হইল। চিত্তরঞ্জন স্বয়ং ঐ সভায় জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিলেন।

ইহার ফল বড় সহজ হইল না। ইংলণ্ডের শক্তিশালী সংবাদপত্র-সমূহে তাঁহার বক্তৃতা উদ্ধৃত হইল এবং প্রবন্ধে ও পত্রে উহার তুমুল সমালোচনা চলিল। ফলে ইংলণ্ডে এ বিষয়ে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। ব্যাপারের এই স্থানেই নিবৃত্তি হইল না। লিবারল দলের নেতা জগদ্‌বরেণ্য মহামতি গ্লাডষ্টোনের নেতৃত্বে ওল্ডহাম নামক স্থানে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইল। লিবারল মতাবলম্বীরা চিত্তরঞ্জনকে সেই সভায় বক্তৃতা দিবার নিমিত্ত আমন্ত্রণ করিলেন। চিত্তরঞ্জন সে দিন যে মর্ম্মস্পর্শিনী বক্তৃতা করেন, তাহার ফলে ভারতের নিন্দুক মিথ্যাবাদী ম্যাক্লিনকে জগতের সমক্ষে ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে হইয়াছিল, ম্যাক্লিনের পার্লামেণ্টের সদস্যপদও ঘুচিয়াছিল। ইহা হইতে চিত্তরঞ্জনের জীবন-প্রভাত হইতেই তাঁহার স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। কবি স্কট বলিয়াছেন,—"এমন মানুষ কি আছে—যাহার আত্মা এতই ঘুমঘোরে অচৈতন্য যে, জন্মভূমির কথা বলিতে আনন্দে গর্ব্বে উচ্ছ্বসিত হইয়া না

উঠে ?" কবি স্কট ভারত দেখেন নাই, ভারতের লোকের সহিত পরিচিত হন নাই। হইলে এমন লোকেরও তিনি পরিচয় পাইতেন, যাহার জন্য তাঁহার এ ধারণা শিথিলমূল হইতে পারিত। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের জীবনের প্রথম প্রভাতেই কবি স্কটের বর্ণিত স্বদেশপ্রেমিকের মহাভাবালোকের কিরণসম্পাত হইয়াছিল। চিত্তরঞ্জনের পরবর্ত্তী জীবনে উহাই দ্বাদশ ভাস্কর-প্রভায় স্বপ্রকাশ করিয়া দেশ ও জাতিকে চিরগৌরবোজ্জ্বল করিয়াছে।

মোটা হ'ক সে সোনা মোদের
মায়ের ক্ষেতের ধান ;
সে যে মায়ের ক্ষেতের ধান।"

চিত্তরঞ্জনের মনের এ স্বাধীনবৃত্তি শৈশব হইতেই স্ফুরিত হইয়াছিল। নিজের পুরুষকার দ্বারা যতটা সম্ভব, ততটা ভাগ্যোন্নতির চেষ্টায় চিত্তরঞ্জন আত্মনিয়োগ করিলেন। এজন্য তাঁহার পরিশ্রমের ত্রুটি ছিল না। হাই-কোর্টে প্রবল প্রতিযোগিতার মধ্যে প্রথম প্রবেশার্থীর প্রসার-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করা—বিশেষতঃ বিনা "মুরুব্বির" সাহায্যে—কষ্টসাধ্য বলিয়া চিত্তরঞ্জন প্রায়শঃ মফঃস্বলের নিম্ন-আদালতে মামলার ভার লইতে লাগি-লেন। সঙ্গে সঙ্গে আইনে ব্যুৎপন্ন হইবার জন্য যোগীর ন্যায় সাধনায় বসিতে লাগিলেন—আইনপুস্তক অধ্যয়নে তিনি প্রথম-শিক্ষার্থীর মত মনোভিনিবেশ করিলেন। সে সময়ে সংসারের কষ্ট ঘুচাইবার জন্য তিনি যে পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা বহু শিক্ষার্থীরই অনুকরণীয়।

প্রতিভার বিকাশ।

সে পরিশ্রমের পুরস্কার মিলিতে অধিক বিলম্বও হইল না। প্রতিভা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত কিছুকাল গুপ্ত থাকিলেও সময়ে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। চিত্তরঞ্জনে যথার্থ ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা ছিল। সেই প্রতিভা-বিকাশের এক সুন্দর অবসর উপস্থিত হইল। বলিয়াছি, চিত্তরঞ্জন চির-দিনই দেশ-প্রেমিক। সে দেশ-প্রেমের পরিচয় দিবার সময় আসিল। বাঙ্গালার সে এক মহাযুগ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কুক্ষণে কি সুক্ষণে বলিতে পারি না, ভারতের তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জন বঙ্গ-ভঙ্গের ব্যবস্থা করিলেন। উহার ফলে দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত হইল, বাঙ্গালীর জীবনে এক নব পর্য্যায় দেখা দিল। জাতির জাগরণের ইতিহাসে উহা চিরস্মরণীয়। সেই স্বদেশী সাধনার দিনে দেশ-প্রেমের ভাব-বন্যায় যাঁহারা আপনি ভাসিয়াছিলেন ও দেশকে ভাসাইয়াছিলেন,

তাঁহাদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ অগ্রণী। তাঁহার "বন্দে মাতরম্" পত্র যে সময়ে দেশবাসীকে যে ভাবে জাতীয় আত্মসম্মানজ্ঞানে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল, এমন আর কিছুতে করিয়াছিল কি না সন্দেহ। বাঙ্গালী অরবিন্দের ডাকে—

"সেদিন প্রভাতে নূতন তপন"
দেখিয়াছিল, বুঝিয়াছিল,
'এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন'

তাহার জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী। সে দিন বাঙ্গালী কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিয়াছিল,—

দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার,
আমার দেশ—
আমরা মুছাব মা তোর কালিমা, মানুষ আমরা
নহি ত মেষ!

অরবিন্দের পক্ষালম্বন

সে জাগরণের দিনে দেশবরেণ্য শ্রীঅরবিন্দ অন্যান্য দেশপ্রেমিকের মত "স্বদেশী" মামলার বেড়াজালে ঘেরা পড়িলেন, সরকার তাঁহার নামে ষড়যন্ত্রের মামলা আনয়ন করিলেন,—সে মামলা ১৯০৯ সালের আলিপুরের বোমার মামলা। দেশ-প্রেমিক চিত্তরঞ্জন সে মামলায় শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে দাঁড়াইলেন। সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মামলায় সরকারপক্ষে ব্যারিষ্টার নর্টনের বিপক্ষে চিত্তরঞ্জন ফৌজদারী আইনে যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি দেখাইলেন, উহাতে তাঁহার যশোভাতি দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সেই সময় হইতেই তিনি বাঙ্গালীর মধ্যে first criminal lawyer আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। সুদীর্ঘ আট মাস কাল

তিনি এই মামলায় নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু ইহা স্বদেশী মামলা বলিয়া তিনি ইহা হইতে যৎসামান্ত পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে সংসারপালনের জন্ত তাঁহাকে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ঋণগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার এই স্বার্থত্যাগের ফল—অরবিন্দের মুক্তি। বিপ্লববাদী যুবকগণের স্বপক্ষে চিত্তরঞ্জনের মর্ম্মস্পর্শিনী বক্তৃতা শ্রবণে প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি উডরফ অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই, আদালতে উপস্থিত ব্যারিষ্টার, উকীল বা অন্তান্ত শ্রোতা ত দূরের কথা। চিত্তরঞ্জন বিজয়-গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া মুক্ত অরবিন্দের হস্তধারণ করিয়া আদালত-কক্ষ ত্যাগ করিলেন। নবভারতের মুক্তির ইতিহাসে ইহা যাবচ্চন্দ্রদিবাকর স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। চিত্ত-রঞ্জনের জীবন-সংগ্রামের প্রথমপ্রভাতে ত্যাগের এই যে অরুণোদয়, উহাই পরে মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডরূপে দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়াছিল।

এক হিসাবে চিত্তরঞ্জন যেমন এই ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, আর এক হিসাবে তেমনই লাভবান্‌ও হইয়াছিলেন। ভগবান্ তাঁহার এ ত্যাগের পুরস্কার দিয়াছিলেন। এই মামলা হইতে চিত্তরঞ্জনকে যেমন ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল, তেমনই এই মামলা হইতেই দেশে দেশে তাঁহার নাম প্রচারিত হইয়া পড়ে এবং লোক তাঁহার গভীর আইনজ্ঞানে আস্থাবান্ হইয়া তাঁহাকে মামলার ভার দিতে থাকে।

ভাগ্যের উন্নতি

ইহার অল্পদিন পরেই ঢাকার প্রসিদ্ধ ষড়যন্ত্র মামলার ভার চিত্তরঞ্জনের উপর ন্যস্ত হয়, চিত্তরঞ্জন আসামীদের পক্ষসমর্থন করেন। এ মামলায় এবং পরবর্ত্তী অনেকগুলি স্বদেশী বয়কট মামলায় আসামীর পক্ষসমর্থন করিয়া চিত্তরঞ্জন যুগপৎ আইন-পাণ্ডিত্যের ও ত্যাগের পরিচয় দেন। এ সব স্বদেশী মামলাতেও তিনি পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু বিধি

সুপ্রসন্ন, তাঁহার ত্যাগ ও পাণ্ডিত্যের মাহাত্ম্য হাইকোর্টেও বিস্তার লাভ করিল, তদবধি কোনও প্রতিযোগিতাই চিত্তরঞ্জনের ভাগ্যোন্নতির পথে অন্তরায় হইতে সমর্থ হইল না।

পিতৃঋণ পরিশোধ।

মামলার পর মামলায় চিত্তরঞ্জন প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। লোকও তাঁহার উপর মামলার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে লাগিল, কেন না, লোকের একটা বিশ্বাসই জন্মিয়া গেল, চিত্তরঞ্জনের আইন-জ্ঞান ও বক্তৃতাশক্তি অজেয়। বস্তুতঃ অরবিন্দের মামলা-জয়ের পরদিনই চিত্তরঞ্জন বলিতে পারিতেন,'আমি প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া দেখিলাম, আমি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছি।' বস্তুতঃ এতদিন যেন চিত্তরঞ্জনের 'পাথর-চাপা কপাল' ছিল, এখন খোদা যেন ছপ্পড় ফুঁড়িয়া চিত্তরঞ্জনের ঘরে টাকা ছড়াইতে লাগিলেন! কিন্তু চিত্তরঞ্জনের মাথা টলিল না—মহৎলোকের টলে না। চিত্তরঞ্জন যতই অর্থোপার্জ্জন করুন, যতই বিলাসের দ্বারা বেষ্টিত থাকুন, তথাপি কখনও পিতৃ-ঋণের কথা বিস্মৃত হন নাই। অন্তরে বাহিরে সে কথা তাঁহার অনুক্ষণ বাজিত। সময় হইল, চিত্তরঞ্জন নিজের রোজগারে পিতৃঋণ পরিশোধ করিলেন। তাঁহার এই পিতৃঋণ পরিশোধ জগতের ইতিহাসে অপূর্ব্ব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি দেউলিয়ার খাতায় পিতার সহিত নাম লিখাইয়াছিলেন; ইচ্ছা থাকিলে তিনি এ ঋণের সম্পর্ক বর্জ্জন করিতে পারিতেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জন আইনের ফাঁকিতে নিজের কর্ত্তব্যজ্ঞান বা বিবেকধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিবার মানুষ নহেন। এইখানেই তাঁহার মনুষ্যত্ব, এইখানেই তাঁহার চিত্তরঞ্জনত্ব। সে মহত্ত্ব দেখিয়া বিস্ময় পুলকে হাইকোর্টের বিচারপতি জষ্টিস ফ্লেচার বলিয়াছিলেন:—"দেউলিয়ার খাতায় নাম লিখাইয়া কেহ আবার পূর্ব্ব-ঋণ পরিশোধ করে, এমন দৃষ্টান্ত আমি কখনও দেখি নাই। ইহাই প্রথম!"

চরিত্র-মাহাত্ম্য

এ মহত্ত্ব চিত্তরঞ্জনের চরিত্রে ছত্রে ছত্রে প্রতিভাত—এ মহত্ত্ব ফুটিয়াছিল নানা দিক্ দিয়া। চরিত্রের উদারতা চিত্তরঞ্জনের মহত্ত্বের প্রধান ভিত্তি। যাহাতে সামান্য সঙ্কীর্ণতা আছে, চিত্তরঞ্জনকে তাহা স্পর্শ করিতে পারিত না। বলিয়াছি, এ বিষয়ে তাঁহার প্রধান সহায় বাসন্তী দেবী! ১৮৯৮ সালে বাসন্তী দেবীর সহিত চিত্ত-রঞ্জনের বিবাহ হয়। বাসন্তী দেবী বিজনী ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান ৺বরদাপ্রসাদ হালদার মহাশয়ের কন্যা। তিনি আদর্শ-চরিত্রা মহৎ-কুলোদ্ভবা নারী—স্বামীর সকল মহৎকার্য্যে সর্ব্বদা উৎসাহদান করা তাঁহার চরিত্রগত। তিনি আদর্শ-গৃহিণী না হইলে চিত্তরঞ্জনের বিপুল সংসারে বহু আত্মীয় পরিজনকে লইয়া মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতে পারিতেন না। আজীবন সুখে, সম্পদে, ভোগে, বিলাসে, লালিতা-পালিতা, আজীবন সংসারের সুখে বেষ্টিতা। কিন্তু মানুষ সুখে, সম্পদে বেষ্টিত থাকিলে তাহার ভিতরের দেবতার অংশ ফুটিয়া বাহির হইবার অবকাশ হয় না। এই জন্য কষ্ট ও বিপদের মধ্য দিয়া মানুষের পরীক্ষা হয়। সে কঠোর অগ্নি-পরীক্ষায় স্বার্থ-শ্যামিকা দগ্ধ হইলে মনুষ্যত্বের খাঁটি সোনা বাহির হইয়া পড়ে। দেবী বাসন্তীর সুখ-সম্পদের একটানা জীবন-স্রোতে যখন সে কঠোর পরীক্ষার ডাক আসিল, তখন তাঁহার দেবীত্ব ফুটিয়া বাহির হইল। যে দিন দেখিলাম, মোটা খদ্দরে ভূষিতা হইয়া নগ্নপদে পথের ধূলায় দেবী বাসন্তী ধূলিকর্দ্দমাক্ত অবস্থায় লোকের দ্বারে দ্বারে স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতির পূত-পবিত্র বাণী শুনাইয়া বেড়া-ইতেছেন, সেই দিন ভক্তি-শ্রদ্ধায় অন্তর ভরিয়া গেল, মস্তক আপনিই অবনত হইয়া আসিল—মনে হইল, যে দেশে যে জাতির মধ্যে এমন দেবীত্বের বিকাশ সম্ভব হয়, সে দেশ ধন্য, সে জাতি ধন্য!

সে সময়ে "বসুমতীর" সেবাকালে দেবী বাসন্তীর সম্বন্ধে দেশবাসীর

নিকট হইতে আমরা আবেগ ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ বহু কবিতা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। উহার একটি নমুনা পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি। এটি বালীর কোনও অবসরপ্রাপ্ত উকীল পাঠাইয়াছিলেন। উহাতে কবিত্ব-শক্তি বা রচনার বিশেষত্ব আছে, এমন কথা বলিতেছি না। তবে উহাতে দেবী বাসন্তীর প্রতি দেশবাসীর হৃদয়ের ভক্তিশ্রদ্ধার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়:—

"কে তুমি মা, দেবীরূপে এসেছ এদেশে,
ঘুচাতে ব্যথার জ্বালা, বঙ্গনারী-বেশে!
রমণী অসূর্য্যম্পশ্যা সুখেতে পালিতা,
ধনৈশ্বর্য্য-সম্পদের কোলেতে লালিতা॥
দয়া-স্নেহ-দেশপ্রেম একাধারে আনি,
গড়িলেন বিধাতা কি তোমারে জননি?
ধৈর্য্যশীলা নগ্নপদে খদ্দরে সাজিয়া
দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছ মুক্তিবাণী নিয়া॥
ধন্য দেবী, ধন্য তব পতি মহাত্যাগী
সর্ব্ব-স্বার্থ তেয়াগিলে এ দেশের লাগি॥
ধন্য জন্মভূমি, ধন্য কলিকাতাবাসী
তব পুণ্যপাদস্পর্শে হেথা গয়া-কাশী॥
তব শান্ত শুদ্ধ মূর্ত্তি বঙ্গবাসী সেবি
ধন্য হবে চিরকাল, হে বাসন্তী দেবি!"

পাঠক, ইহা হইতে বুঝিতেছেন, দেবী বাসন্তী তাঁহার নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক পবিত্র চরিত্রগুণে দেশবাসীর অন্তরের ভালবাসা ও ভক্তিশ্রদ্ধা কিরূপ অর্জ্জন করিয়াছেন। যিনি দেশ-রূপ বৃহৎ সংসারের এমন হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনি যে তাঁহার নিজের ক্ষুদ্র সংসারের পরমারাধ্যা পরমপ্রিয়া গৃহিণী হইবেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। এ সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জনের নিকটাত্মীয় সুকুমার বাবু বলিয়াছেন,—"চিত্তরঞ্জন পিতার

জ্যেষ্ঠপুত্র; সুতরাং পিতার অসুস্থতায় ভ্রাতা-ভগিনীদিগের শিক্ষা ও ভরণপোষণের ভার তাঁহারই উপরে পড়িয়াছিল। চিত্তরঞ্জন অম্লান-বদনে এই কর্ত্তব্যের ভার মাথায় পাতিয়া লন এবং ভ্রাতা-ভগিনীগণের উত্তম শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, সৎপাত্রে ভগিনীদিগের বিবাহদান করিয়া সে কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করিয়া আসিয়াছেন। চিত্তরঞ্জনের দুই সহোদর ও পাঁচ ভগিনী ছিল। সহোদর দুইটীকেও বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার করিয়া আনিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠা ভগিনী এক পুত্র এবং কয়েকটি কন্যা লইয়া অল্পবয়সে বিধবা হইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র-কন্যাদের দেখা-শুনার ভার চিত্তরঞ্জনকে লইতে হইয়াছিল। আর একটি ভগিনীও অকালে রোগে ভুগিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। সর্ব্বকনিষ্ঠ সহোদর বসন্তরঞ্জনও ব্যারিষ্টারীতে নাম করিয়া উঠিতেছিলেন, তিনিও অল্পবয়সে বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে শোকে ভাসাইয়া চলিয়া যান। চিত্তরঞ্জনের একমাত্র জীবিত সহোদর প্রফুল্লরঞ্জন দাশ এখন পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি। সুপ্রসিদ্ধা সঙ্গীতভক্তা অমলা দাশগুপ্তা তাঁহার সহোদরা ছিলেন। সে দিন চিত্তরঞ্জনের এক উপযুক্ত ভগিনীপতি অনন্ত বাবু উর্ম্মিলা দেবীর স্বামী সকলের মায়া কাটাইয়া চলিয়া গেলেন। এই পারিবারিক শোকে দুঃখে সর্ব্বাপেক্ষা শান্তি পাইতেন পত্নী বাসন্তী দেবীর নিকটে। হিন্দুধর্ম্মের শাস্ত্রকারগণ সহধর্ম্মিণীর যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, বাসন্তী দেবীতে তাহা সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য। তিনি শোকে স্বামীর সান্ত্বনাদায়িনী, তাঁহার সাহিত্য চর্চ্চায় সহযোগিনী, তাঁহার কাব্যের নিরপেক্ষ পাঠক ও সমালোচক এবং সর্ব্ব-শেষে তাঁহার দেশব্রতে সহকর্ম্মিণী। তাঁহার দেবর ও ননন্দিনীরা তাঁহাকে মাতৃতুল্যা জ্ঞান করেন এবং খুব সম্ভ্রমের চক্ষে দেখেন। তাঁহার ব্যবহারে তাঁহাকে ভয় না করিয়া শুধু জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত ভালবাসিতেই শিক্ষা দেয়।"

এমন আদর্শ-গৃহিণীর মঙ্গল-হস্তস্পর্শে চিত্তরঞ্জনের গৃহে যে লক্ষ্মীশ্রী

স্বতঃই ফুটিয়া উঠিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই মহীয়সী সহধর্ম্মিণীর সংস্পর্শে চিত্তরঞ্জনের চরিত্রের মহিমা-শোভার শতদল বিস্তারে সকলকেই চমৎকৃত ও মোহিত করিয়াছে। তাঁহার পারিবারিক, সাহিত্যিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক—যে কোনও জীবনেরই আলোচনা করা যাউক না, সকল ক্ষেত্রে এ কথার যথার্থতা প্রমাণিত হইবে। দেবী বাসন্তীর মনেও যেমন সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতার গন্ধমাত্রও নাই, চিত্তরঞ্জনেরও তেমনই। তাঁহার উদার, উন্মুক্ত, সরল, অকপট, স্বার্থশূন্য, পরদুঃখকাতর জীবনের চিত্র এইবার যথাসম্ভব সংক্ষেপে পাঠকের নয়নসমীপে প্রতিফলিত করিবার প্রয়াস পাইব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সামাজিক জীবন

চিত্তরঞ্জনের পারিবারিক, সামাজিক এবং সাহিত্যিক জীবনের পরিচয় এই অধ্যায়ে বিবৃত করিব। পারিবারিক জীবনে চিত্তরঞ্জন পিতৃ-ভক্ত ও মাতৃ-অনুরক্ত পুত্র, গুণময় স্বামী, স্নেহশীল পিতা, কর্ত্তব্যপরায়ণ ভ্রাতা ও গৃহস্বামী। তিনি কিরূপে পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এ যুগে এমনভাবে পিতৃসত্য-পালন সকলেরই অনুকরণীয়। ভ্রাতা-ভগিনী ও আত্মীয়-কুটুম্ব-পালনে চিত্তরঞ্জন যে উদারতা ও মহানুভবতা দেখাইয়াছেন, তাহাও যে কোনও একান্নভুক্ত পরিবারে অধুনা আদর্শ-যোগ্য।

সামাজিক জীবনে চিত্তরঞ্জনের অমায়িকতা, সৌজন্য ও বদান্যতা উদাহরণযোগ্য। চিত্তরঞ্জন ধনবান্ ব্যারিষ্টার, অথচ জনসাধারণের সহিত ব্যবহারে তাঁহার অহমিকতার লেশমাত্র নাই। ভোজে, সভায়, বা সাহিত্যিক সম্মেলনে অনেকেই ইহা অনুভব করিয়াছেন। 'নারায়ণ' পত্র সম্পাদনের সংস্রবে যে কেহ তাঁহার সংস্রবে আসিয়াছেন, তিনিই ইহা স্বীকার করিবেন। সমাজের সকল স্তরের লোকেরই চিত্তরঞ্জনের নিকট অবারিত দ্বার। সমাজের যেখানে ব্যথা, সেখানেই চিত্তরঞ্জনের স্নেহার্দ্র হৃদয় চুম্বকের নিকট লৌহের মত আকৃষ্ট হইয়া থাকে। চিত্ত-রঞ্জন যথার্থই দরিদ্র দীন আর্ত্তের বন্ধু। তিনি জীবনে প্রভূত অর্থ উপা-র্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু দীন আতুরের সেবায় তাঁহার দান অফুরন্ত বলিয়াই বিদিত। প্রার্থী কখনও ভিক্ষা করিয়া তাঁহার নিকট বিমুখ হইয়াছে, শুনা যায় নাই। যাহা উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা কখনও সঞ্চয় করেন নাই—তাঁহার সঞ্চয় ছিল দিলীপের 'ত্যাগায় সংভৃতার্থানাম্।' আজ যদি

চিত্তরঞ্জন সাধারণ উপার্জ্জনশীল ব্যারিষ্টারের মত সঞ্চয়ে মনোভিনিবেশ করিতেন, তাহা হইলে বড় জমীদার হইতে পারিতেন, কেন না,ইদানীন্তন তাঁহার মাসিক আয় ৩০ হাজারেরও অধিক ছিল। কিন্তু দরিদ্রনারায়ণের দুঃখ দেখিলে তিনি সঞ্চয়ের কথা ভুলিয়া যাইতেন, তাই আজ তিনি রিক্তহস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ তিনি খবরের কাগজে ঢাক পিটিয়া কখনও দান করিতেন না, দশরথের মত 'ত্যাগে শ্লাঘাবিবর্জ্জিত' হইয়া দান করিতেন। সরকারী খেতাবের আশাতেও তিনি কখনও দান করেন নাই। এ বিষয়ে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার চরিত্র তুলনীয়। কত উপায়হীন ছাত্রকে তিনি পালন করিয়াছেন, লেখাপড়া শিখাইয়াছেন, মানুষ করিয়া দিয়াছেন, কত দরিদ্র বিধবার দুঃখে তিনি নয়নজলে ভাসিয়াছেন, অর্থসাহায্য করিয়াছেন, কত দুঃস্থ সাহিত্যসেবী তাঁহার সাহায্যে সংসার-সংগ্রামে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার সংবাদ কে রাখে? কত কন্যাদায়গ্রস্ত তাঁহার সাহায্যে বিপন্মুক্ত হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করে?

সমাজের ইঁহারাই মেরুদণ্ড। প্রাচীন যুগে আমাদের বাঙ্গালার পল্লী-সমাজে এমনই 'সামাজিক' লোক জন্মগ্রহণ করিতেন। এখন সকলেই 'চাচা আপনি বাঁচা!' প্রায়ই সকল পরিবারেই দেখা যায়, 'আপনি আর কোপ্‌নি!' তখনকার কালে গ্রামের 'সামাজিক' মণ্ডলরা নিত্য কাহার বাড়া হাঁড়ী চড়িল না, তাহার সংবাদ রাখিতেন, কাহার কন্যার বিবাহের ব্যাঘাত ঘটিতেছে, তত্ত্ব লইতেন। তাঁহাদের যত দোষই থাকুক, এই যে পরস্পরের মধ্যে প্রাণের সাড়া—এ গুণটি কিন্তু বিদ্যমান থাকিত। চিত্তরঞ্জনে সে সামাজিকতার বিকাশ হইয়াছিল।

দেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি লোকহিতকর কার্য্যে চিত্তরঞ্জনের দান সামান্য নহে। তবে লোকে তাহার খবর রাখে না। বর্ত্তমান জাতীয় শিক্ষানুষ্ঠানের উন্নতিকল্পে তিনি সর্ব্বস্ব দান করিয়াছেন, এ কথা সকলে জানেন। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে কলিকাতা ব্রাহ্মবিদ্যালয়ের নূতন

গৃহনির্ম্মাণকল্পে বেলগাছিয়ার মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে এবং বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে তিনি যাহা দান করিয়াছেন, তাহা কয়জন জানে? বার্ষিক সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনকল্পে চিত্তরঞ্জন প্রতিবৎসর মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন। পুরুলিয়ায় তাঁহার পিতার একটি বৃহৎ অট্টালিকা ছিল। উহাতে চিত্তরঞ্জন এক অনাথ-আতুর-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, উহাতে তাঁহার ব্যয় হইত মাসিক দুই হাজার টাকা। ভগিনী অমলা সে আশ্রমের ভার লইয়াছিলেন। তিনি স্বহস্তে অনাথ, আতুর, অন্ধ, খঞ্জগণের মলমূত্র পর্য্যন্ত পরিষ্কার করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। তিনি ভ্রাতার উপযুক্ত ভগিনী ছিলেন। কিন্তু অমলা দেবীর অকালমৃত্যুতে আশ্রমের কার্য্য বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হওয়াতে চিত্তরঞ্জন নদীয়ার নিত্যানন্দ আশ্রমের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া পুরুলিয়াস্থ অনাথ-আতুরগণকে তথায় প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে তিনি নিত্যানন্দাশ্রমে দুই লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার এ দানের কথা তাঁহার আত্মীয়েরাও জানিতেন না। ভবানীপুরের অনাথ-আশ্রম চিত্তরঞ্জনের আর এক বিরাট কীর্ত্তি। ইহাতেই তিনি প্রভূত অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন।

দুঃস্থ সাহিত্যসেবীর সাহায্যকল্পে চিত্তরঞ্জন অনেক সময়ে অযাচিতভাবে অনেক টাকা দান করিয়াছেন। চিত্তরঞ্জন বহু সাহিত্যসেবীর অভাবমোচন করিয়াছেন, বহু রচকের গ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচারে অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন। ইহার প্রমাণ অনেক আছে, এখানে দুই একটির উল্লেখ করিব। পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নের বেদবিদ্যার প্রচারকল্পে চিত্তরঞ্জন সাহায্য দান না করিলে উহার প্রচার হইত কি না সন্দেহ। স্বর্গগত পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি যখন ঋণের দায়ে তাঁহার বড় সাধের 'সাহিত্য' পত্র বন্ধ করিতে প্রায় বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের অকৃত্রিম সুহৃদ চিত্তরঞ্জন তাঁহার সাহিত্যপত্রের ঋণ পরিশোধ করিয়া দেন। পূর্ব্ববঙ্গের স্বভাব-কবি ৺ গোবিন্দচন্দ্র দাস যখন অর্থাভাবে

সমাজ-পরিত্যক্ত পারিয়ায় পরিণত হইয়াছিলেন, ক্ষুধার জ্বালায় বাঙ্গালীর এই কবি যখন গাহিয়াছিলেন,—

"ও ভাই বঙ্গবাসি!
আমি মলে তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ।
আজ যে আমি উপোস করি,
না খেয়ে পরাণে মরি,
হাহাকারে দিবানিশি,
ক্ষুধায় করি ছটফট!"

তখন এই চিত্তরঞ্জনই তাঁহাকে বুকে তুলিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহার মুখে অন্ন, হৃদয়ে ভালবাসা তুলিয়া দিয়াছিলেন। বাঙ্গালী যদি আর কিছুর জন্য চিত্তরঞ্জনের নিকট কৃতজ্ঞ না থাকে, তবে তাঁহার এই স্বদেশ ও স্বজাতির সাহিত্য-প্রীতির জন্য থাকিবে সন্দেহ নাই।

চিত্তরঞ্জন দেশের জন্য হৃদয়ের প্রীতির দ্বার সদাই উন্মুক্ত রাখিয়াছেন বটে, তবে আপনার ক্ষুদ্র সেই গ্রামের কথা কখনও ভুলেন নাই সেখানে বিদ্যালয় ও পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা, স্বাস্থ্যোন্নতিবিধান এবং গ্রামবাসীর স্বাবলম্বনবৃত্তি উন্মেষকল্পে তাঁহার কখনও চেষ্টার বিরাম হয় নাই। একবার ১৯১৯ সালে যখন পূর্ব্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল, তখন চিত্তরঞ্জন স্বয়ং দশ হাজার টাকা অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন এবং ধনবান্ মাড়োয়ারী বন্ধুদের নিকট হইতেও চাঁদা সংগ্রহ করিয়া বিস্তর অর্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

তাহার পর তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে চাঁদপুরের শ্রমিক বিভ্রাটকালে চিত্তরঞ্জন দেশের শ্রমিকভ্রাতৃগণের দুঃখে আত্মহারা হইয়া ছুটিয়া গিয়াছিলেন, যথাসাধ্য অর্থসাহায্যদানে কুলীর দুঃখ ঘুচাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। যখন ষ্টীমার ধর্ম্মঘট হয়, তখন ষ্টীমারের অভাবে চাঁদপুর যাওয়া হয় না বলিয়া চিত্তরঞ্জন সস্ত্রীক ক্ষুদ্র নৌকায় দুস্তর তরঙ্গ-ভঙ্গ-ভীষণ পদ্মায় পাড়ি দিয়াছিলেন, তবু কর্ত্তব্য পথ পরিত্যাগ করেন

নাই। এ মহৎ প্রাণের দৃষ্টান্তেও যদি দেশের উদীয়মান যুবকবৃন্দ অনুপ্রাণিত না হয়, তবে আর কিসে হইবে, আমি বলিতে পারি না!

চিত্তরঞ্জনের সাহিত্যিক জীবনও এমনই মহত্ত্ব-মাখা। তিনি যেমন বাঙ্গালা-সাহিত্যসেবীর সাহায্যকল্পে মুক্তহস্ত ছিলেন, তেমনই সেই সাহিত্যের সেবাতে নিজেও মনপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাগর-সঙ্গীত' বাঙ্গালা সাহিত্যে অমূল্য দান। তাঁহার "মালঞ্চ" "মালা", "অন্তর্যামী", "কিশোর কিশোরী"—বাঙ্গালা পদ্য সাহিত্য-ভাণ্ডারের সম্পদ সঞ্চিত করিয়াছে সন্দেহ নাই। তাঁহার মাসিকপত্র "নারায়ণ" এখনও গৌরবের সহিত পরিচালিত হইতেছে। ইহাতেও চিত্তরঞ্জনের নানা প্রবন্ধে বাঙ্গালা ভাষার সম্পদ-বৃদ্ধি হইয়াছে। তবে আমি এখানে চিত্তরঞ্জনের কবিতা বা গদ্য রচনার সমালোচনা করিতে বসি নাই, সে যোগ্যতাও আমার আছে কি না সন্দেহ। আমি এখানে তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি মাত্র। মানুষ যে তাঁহার কত বড় প্রিয়, আপনার জন, তাহার জন্য তাঁহার প্রাণ যে কত কাঁদে, কেবল এইটুকুই আমি কবির কাব্য হইতে তুলিয়া দেখাইব। 'মালঞ্চে' কবি চিত্তরঞ্জন গাহিয়াছেন :—

"তুমি উচ্চ হতে উচ্চ, ধার্ম্মিকপ্রবর!
তুচ্ছ করি অতি তুচ্ছ আমাদের প্রাণ
ওগো কোন্ শূন্য হতে আনিয়া ঈশ্বর
জীবনে তাহারি কর আরতির গান?
ভ্রাতার ক্রন্দন শুনি চেয়ো না ফিরিয়া
ধরণীর দুঃখ-দৈন্য আছে যাহা থাক;
ঊর্দ্ধমুখে পূজা কর দেবতা গড়িয়া,
প্রাণপুষ্প অযতনে শুকাইয়া যাক।"

মানুষের সেবা, দরিদ্রনারায়ণের সেবা অপেক্ষা বড় কাজ কবির নিকট কিছুই নাই; ইহাতেই ঈশ্বরের পূজা হয়, ইহাতেই ঈশ্বর প্রীত হন—

ইহাই কবির আদর্শ। কেবল ঈশ্বরের উদ্দেশে ফুল ফেলিয়া পূজা দিলে ঈশ্বরের পূজা হয় না, হৃদয়ে মনুষ্য-প্রীতি চাই, প্রাণের যথার্থ স্পন্দন চাই। সে স্পন্দন কিসে ব্যক্ত হয়?—কবি অন্যত্র তাহা বুঝাইয়াছেন :—

"অপরের দুঃখজ্বালা হবে মিটাইতে
হাসি আবরণ টানি দুঃখ ভুলে যাও,
জীবনের সরবস্ব অশ্রু মুছাইতে
বাসনার সুর ভাঙ্গি বিশ্বে ঢেলে দাও।
হায় হায় জনমিয়া যদি না ফুটালে
একটি কুসুমকলি নয়ন-কিরণে
একটি জীবন-ব্যথা যদি না জুড়ালে
বুকভরা-প্রেম ঢেলে কি ফল জীবনে।
আপনা রাখিলে ব্যর্থ জীবন-সাধনা
জনম বিশ্বের তরে—পরার্থে কামনা।"

যে মহাপ্রাণ হইতে এ বিশ্ব-মানব-প্রেম-উৎস উদ্গত হইয়াছে, দেশ সেবায় পরে তাহা মন্দাকিনীধারারূপে প্রবাহিত হইয়াছে, দেশ সে ধারায়-স্নাত-প্লাবিত হইয়া ধন্য হইয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাজনৈতিক জীবন

সামাজিক জীবনে চিত্তরঞ্জনে সঙ্কীর্ণতার ছায়া স্পর্শ করে নাই। ১০৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হইতে ১৯০৬ সালের কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশন পর্য্যন্ত কংগ্রেসে রাজনৈতিক বক্তৃতা একটা সখের জিনিস ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রতি বৎসর কংগ্রেস বসিত, প্রতি বৎসরই মামুলী ভিক্ষার বক্তৃতা হইত। রাজনীতি কতকটা ছেলেখেলা ছিল, উহাতে জাতির জীবন্-মরণের কথা উঠিত না। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পর রাজনীতি দেশের ধর্ম্মনীতি হইয়া উঠিল। ১৯০৬ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে প্রেসিডেণ্ট মিঃ দাদাভাই নৌরোজী প্রথম ভারতীয়ের পক্ষ হইতে স্বরাজ বা স্বায়ত্ত-শাসন কামনা করিলেন, জাতির প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ঐ কামনায় মূর্ত্ত হইয়া উঠিল।

অবশ্য, পূর্ব্ববর্ত্তী কংগ্রেস সমূহে ভারতের নব-জীবনের ইতিহাস আছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কংগ্রেসেই জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষার ক্রমবিকাশ হইয়াছিল। কংগ্রেসই বৎসরে বৎসরে জাতির দেশাত্মবোধ জাগাইয়া রাখিয়াছিল, কংগ্রেস হইতেই স্বরাজ বা স্বায়ত্ত-শাসনের আদর্শ ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল, জাতির স্বাবলম্বনবৃত্তি ও আত্মশক্তির উপর আস্থা জাগিয়াছিল। যাহাকে ইংরাজী ভাষায় Nationalism বলে, উহার ধারণা কংগ্রেস হইতেই এদেশবাসীর হইয়াছিল। এই হেতু কংগ্রেসম্যান আমলাতন্ত্র সরকারের কর্ম্মচারিমাত্রেরই চক্ষুঃশূল হইয়াছিল।

কিন্তু ১৯০৬ সালের পূর্ব্বে কংগ্রেসের রীতি-নীতি মুষ্টিমেয় শিক্ষিত

সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দেশ বলিতে যাহাদের বুঝায়, যাহারা দেশের এক শতের মধ্যে নব্বই জনেরও উপর, সেই চাষী, মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকাদি জনসাধারণের সহিত কংগ্রেসের শিক্ষিত নেতৃবর্গের কোনও সম্পর্ক ছিল না। তাঁহারা যেন দেশ-ছাড়া লোক। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশীর যুগের সময় হইতে এই ভাবটা ক্রমশঃ দূর হইতে লাগিল, কংগ্রেসের Aristrocracy ভাঙ্গিয়া গিয়া ক্রমশঃ Democracy দেখা দিতে লাগিল।

ইহার প্রথম সূত্রপাত ১৯০৫ সালের ৬ই জুলাই বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশান গৃহে কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনে। উহাতে ষ্টাণ্ডিং কংগ্রেস কমিটী গঠন ও অভ্যর্থনা-সমিতি গঠন লইয়া প্রাচীন দলের সহিত নবীন দলের প্রথম সংঘর্ষ হয়। সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রাচীন দলের, আর উদীয়মান নবীন দলের মুখপাত্র চিত্তরঞ্জন, শ্যামসুন্দর, বিপিনচন্দ্র, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, হেমেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি। ১১ই জুলাই কমিটীর সভায় উভয় দলের শক্তিপরীক্ষা হয়। সে পরীক্ষায় নবীন দলই জয়লাভ করেন। বাঙ্গালায়—কেবল বাঙ্গালায় কেন, সমগ্র ভারতে গণতন্ত্রপ্রতিষ্ঠার ইহাই সূত্রপাত, সে যজ্ঞে চিত্তরঞ্জনই প্রধান হোতা হইলেন। ইহার পর সুরাটে উদীয়মান গণতন্ত্রবাদীরা প্রাচীনপন্থীদিগের একাধিপত্যের বিলোপসাধন করেন। সে সব ইতিহাসের কথা।

চিত্তরঞ্জনের উদার বিশ্বপ্রেমিক মন চিরদিনই এই aristrocracyর সঙ্কীর্ণতা একাধিপত্যভোগের বিরুদ্ধবাদী,—তা সামাজিক ব্যাপারেই হউক বা রাজনৈতিক ব্যাপারেই হউক। যাঁহারা ১৯১৭ সালের বাঙ্গালার প্রাদেশিক কনফারেন্সে সভাপতি চিত্তরঞ্জনের অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এ কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন। তাঁহার বক্তৃতা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"এই যে রাষ্ট্রীয় চিন্তা বা চেষ্টা, ইহার সার্থকতা কোথায়? এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—বাঙ্গালীকে মানুষ করিয়া

তোলা। সেই জন্য আমাদের এখন ঠিক কি অবস্থা, তাহার বিচার করিতে হইবে। সেই বিচার করিতে হইলে আমাদের আর্থিক অবস্থা কিরূপ, তাহা বিচার করিতে হইবে। সেই বিচার করিতে হইলে আমাদের চাষাদের চাষের সন্ধান লইতে হইবে। আমাদের চাষের সন্ধান ভাল করিয়া লইতে হইলে আমাদের চাষ বাড়িতেছে কি কমিতেছে, তাহার খোঁজ রাখিতে হইবে। সেই কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে হইবে, কেন পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া অনেক লোক সহরে আসিয়া বাস করে। সেই কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে বিচার করিতে হইবে যে, সে কি পল্লীগ্রামের অস্বাস্থ্যের জন্য, কি অন্য কারণে? ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, রাজনীতির সাধন করিতে হইলে আমাদের চাষাদের অবস্থা চিন্তা করা আবশ্যক এবং তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রামের অস্বাস্থ্যের কারণ অনুসন্ধান করাও আবশ্যক। সেই সঙ্গে ইহাও বিচার করিতে হইবে যে, আমাদের দেশে যত চাষযোগ্য জমী আছে, সব ভাল করিয়া চাষ করিলেও আমাদের অবস্থা স্বচ্ছল হয় কি না। যদি না হয়, তবে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা আলোচনা ও বিচার করিতে হইবে।"

পুরাতন পন্থায় জনসাধারণকে দেশের এই আন্দোলন হইতে দূরে রাখা হইয়াছিল, এ জন্য শিক্ষিত সমাজই দায়ী। তাই চিত্তরঞ্জন ঐ বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন :—

"আমরা যে শিক্ষিত বলিয়া অহঙ্কার করি, সেই আমরা দেশের কতটুকু স্থান অধিকার করিয়া থাকি? আমরা কয় জন? দেশের আপামর সাধারণের সঙ্গে আমাদের যোগ কোথায়? আমরা যাহা ভাবি, তাহারা কি তাই ভাবে? সত্য কথা বলিতে হইলে কি স্বীকার করিব না যে, আমাদের উপর আমাদের দেশবাসীদের সেরূপ আস্থা নাই? আমরা যে তাহাদের ঘৃণা করি। কোন্ কাজে তাহাদের ডাকি?"

এখানেও চিত্তরঞ্জনের উদার হৃদয়ের ও মহত্ত্বের পরিচয় প্রস্ফুট। দেশের দরিদ্রনারায়ণকে বাদ দিয়া দেশ-সেবা হয় না, এ বাণী

চিত্তরঞ্জনেরই মত মহাপ্রাণের মুখে সাজে। চিত্তরঞ্জন ময়মনসিংহের এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,—"দেশের কাজ আমার ধর্ম্মের অঙ্গ। উহা আমার জীবনের আদর্শ। আমার দেশের কল্পনায় আমি ভগবানের মূর্ত্তির বিকাশ দেখিতে পাই।"

এত বড় উচ্চাঙ্গের স্বদেশ-প্রেম-তন্ময়তা কয়জন দেখাইতে পারিয়াছেন? বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র একদিন সুজলা সুফলা বঙ্গমাতার এই বিশ্বজননী দশপ্রহরণধারিণীর রূপ অনুভব করিয়াছিলেন, এই তন্ময়তা চিত্তরঞ্জনকে দেশসেবায় সার্থকতা আনিয়া দিয়াছিল। তাই তিনি অগাধ অর্থোপার্জ্জনের মায়া কাটাইয়া ১৯১৭ সালে মণ্টেগু সংস্কারের সম্পর্কে পূর্ব্ববঙ্গের বহুস্থানে—ময়মনসিং, ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কেন্দ্রে তাঁহার এই মর্ম্মের বাণী প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। ঢাকার এক বক্তৃতা হইতে চিত্তরঞ্জনের প্রাণের কথা উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠক উহা হইতেই তাঁহার বুঝাইবার শক্তি অনুভব করিতে পারিবেন।

"স্বায়ত্তশাসন ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে কতটুকু অধিকার দিবেন এবং কতটুকু দিবেন না, এ সমস্ত ভাবিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। দেশের মঙ্গলের জন্য আমাদিগের যতটুকু অধিকার প্রয়োজন, আমাদিগকে ততটুকুই দাবী করিতে হইবে, গবর্ণমেণ্ট দিবেন কি দিবেন না তাহা ভাবিবার আবশ্যকতা নাই। আপনারা ভীত হইয়া কোন কাজ করিবেন না, দেশের মঙ্গলের জন্য যেরূপ শাসনবিধি প্রয়োজন মনে করেন, তাহাই গবর্ণমেণ্টের নিকট নির্ভয়ে উপস্থিত করিতে হইবে।"

স্বায়ত্তশাসন কেন চাই, তাহাও চিত্তরঞ্জন ঐ বক্তৃতায় বুঝাইয়াছিলেন। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান চরমপন্থীরা এই মণ্টেগু সংস্কারে ঘোর আপত্তি তুলিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল, ভারত এক দেশ নহে, এক জাতি, এক বর্ণ বা এক ধর্ম্মেরও নহে, সুতরাং এই নানারূপ বিভিন্ন স্বার্থের সংঘর্ষের সম্ভাবনা যেখানে, সেখানে শাসন-সংস্কার করা অথবা স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত করা যুক্তিসঙ্গত নহে। উত্তরে চিত্তরঞ্জন ঐ

বক্তৃতায় বলেন, "ভিন্ন ভিন্ন সমাজ ও বিভিন্ন স্বার্থের লোককে একতাবদ্ধ করিতে হইলে এবং সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করিতে হইলে তাহাদিগকে একত্র হইয়া একই মঙ্গল উদ্দেশ্যসাধনের সুযোগ দিতে হইবে, সুতরাং আমাদের ধর্ম্মগত, জাতিগত ও স্বার্থগত বৈষম্য ও অনৈক্য দূর করিতে হইলে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনই একমাত্র উপায়।"

কিন্তু এই স্বায়ত্তশাসনের স্বরূপ কিরূপ হইবে, ইহা লইয়া প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থীদলে ঘোর মতবিরোধ ও মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। চিত্ত-রঞ্জন বাঙ্গালায় নবীনপন্থী জাতীয় দলের নেতৃত্বপদে বরিত হইয়াছিলেন, ইহা ১৯০৫ সালের ঘটনা হইতেই পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। তদবধি দেশবাসী তাঁহারই উপর তাহাদের রাজনৈতিক আশাভরসা স্থাপন করিয়াছিল। ১৯১৭ সালে কলিকাতা কংগেসে কে সভাপতি হইবেন, ইহা লইয়া উভয় দলে ঘোর মতবিরোধ উপস্থিত। চিত্তরঞ্জনের জাতীয়দল মিসেস্ বেসাণ্টকে এবং প্রাচীনপন্থা দল অথবা মডারেট (মধ্যপন্থী) দল মামুদাবাদের রাজাকে মনোনয়ন করিল। অবশেষে জাতীয় দলেরই জয় হইল, আনি বেসাণ্ট কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট হইলেন। কিন্তু তখন হইতে মডারেট (প্রাচীন) ও নরম একসটিমিষ্ট (নবীন গরম) দল একবারে পৃথক্ হইয়া গেল। বাঙ্গালার রাজনীতিক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্ব দৃঢ়মূল হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইল।

নেতার গৌরবময় পদে অধিষ্ঠিত হইয়া চিত্তরঞ্জন ১৯১৭ সালে বরিশালে জাতীয়দলের পক্ষ হইতে স্বায়ত্তশাসনের স্বরূপ বর্ণনা করেন। উহা এই-রূপ :—

"ইহা হিন্দুদিগের স্বায়ত্তশাসন হইবে না, মুসলমানদিগের স্বায়ত্তশাসন হইবে না, জমীদারদের স্বায়ত্তশাসন হইবে না, ইহা হইতে সমগ্র বাঙ্গালার প্রজাতন্ত্রের স্বায়ত্তশাসন, ইহাতে সকলের স্বার্থ সমানভাবে রক্ষিত হইবে। এবং যাহারা সমাজে প্রপীড়িত, তাহাদের বলিতে হইবে, এমন স্বায়ত্ত-শাসন যত শীঘ্র স্থাপিত হয়, ততই তাহাদের পক্ষে মঙ্গলজনক। এই

দায়িত্বপূর্ণ শাসন-প্রণালীতে তাহাদের নিকট যে ক্ষমতা আসিবে, তাহাতে তাহারা সকল অত্যাচার রোধ করিতে পারিবে।"

তখনও পর্য্যন্ত চিত্তরঞ্জনের মনে পূর্ণ উৎসাহ,—তাঁহার বড় সাধের ভারত পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, তাঁহার মনে রচা স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্ত হইবে, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারতকে ঐ স্বায়ত্তশাসন অর্পণ করিবেন।

যখন ১৯১৮ সালে বিলাতে কংগ্রেসের প্রতিনিধি পাঠাইয়া ভারতের মনের কথা জানাইবার চেষ্টা হয়, তখন কলিকাতার এক সভায় চিত্তরঞ্জন বলেন, "গত ৩০ বৎসরের মধ্যে যে কোনও শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতেই এই আমলাতন্ত্র বাধা জন্মাইয়াছে ও সংস্কারের পথ রুদ্ধ করিয়াছে, সুতরাং আমলাতন্ত্রের নিকট হইতে কোনওরূপ রাজনৈতিক অধিকার পাইবার আশা বৃথা। আমাদিগকে আমলাতন্ত্রের পরিচালকদের নিকট যাইতে হইবে। ব্রিটিশ জনসাধারণের নিকট আমাদের ন্যায্য দাবী উপস্থিত করিতে হইবে।"

কেমন, ইহার মধ্যে চিত্তরঞ্জনের দেশবাসীর ন্যায্য অধিকার-প্রাপ্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইলেও কোথাও একটুকু ব্রিটিশ বিদ্বেষের পরিচয় আছে কি? চিত্তরঞ্জন তখন ইংরেজকে বা ইংরেজ পার্লামেণ্টকে ত ছাঁটিয়া ফেলিবার কথা তুলেন নাই। তাঁহার কামনা ছিল, বর্ত্তমান আমলাতন্ত্র-শাসনের পরিবর্ত্তে দায়িত্বপূর্ণ গণতন্ত্র-শাসন প্রতিষ্ঠা করা।

ইহার পর মণ্টেগু-সংস্কারের আইন যে মূর্ত্তিতে দেখা দেয় ও দেশের আইন-পুস্তকে স্থান পায়, উহা চিত্তরঞ্জন ও জাতীয় দলের যে মনঃপূত হয় নাই, উহা বলাই বাহুল্য। পরন্তু সরকার ১৯১৮ সালে রাউলাট কমিটী নিযুক্ত করিলেন এবং ১৯১৯ সালের প্রারম্ভে রাউলাট কমিটীর প্রস্তাবিত ধর্ষণনীতিমূলক দুইটি বিলের বিপক্ষে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। কিন্তু আন্দোলনেও ফল হইল না। ১৯১৯ সালের মার্চ্চ মাসে রাউলাট আইন পাশ হইল। ফলে মহাত্মা গন্ধীর 'সত্যাগ্রহ' ঘোষণা, দিল্লীর হাঙ্গামা, পঞ্জাবের অনাচার,—সে সব ইতিহাসের কথা, উহা পূর্ব্বে বর্ণিত

হইয়াছে। তাহার উপর খেলাফতের বেদনা ও মুসলমানের 'মতাজের' হইবার সাড়া। দেশময় এক বিরাট্ চাঞ্চল্য দেখা দিল। প্রতীকারের উপায় না দেখিয়া মহাত্মা গন্ধী সহযোগিতাবর্জ্জনমন্ত্র প্রচার করিলেন। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মহাত্মাজীর অহিংস অসহযোগনীতি গৃহীত হইল। স্বয়ং কংগ্রেসের সভাপতি লালা লজপৎ রায়, চিত্তরঞ্জন, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি অনেকে ইহার প্রতিবাদ করিলেন; কিন্তু প্রতিবাদ সত্ত্বেও ভোটাধিক্যে মহাত্মার প্রস্তাব গৃহীত হইল। এই সময় হইতে চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক জীবননাটকে আর এক অধ্যায় আরম্ভ হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অসহযোগী চিত্তরঞ্জন

এতদিন চিত্তরঞ্জন আমলাতন্ত্র-সরকারের সহিত সহযোগই করিয়া আসিয়াছেন। মহাত্মা গন্ধী রাউলাট আইন পাশের পর যখন প্রতিবাদ-স্বরূপ সত্যাগ্রহ ঘোষণা করেন, তখনও চিত্তরঞ্জন কলিকাতার গড়ের মাঠের বিরাট সত্যাগ্রহ সভায় মহাত্মা গন্ধীর পূর্ণ সমর্থন করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন :—

"আজ মহাত্মা করমচাঁদ গন্ধীর দিন। আজ বাঙ্গালীর হৃদয়ের বেদনা প্রকাশ করিবার দিন। আনন্দের দিনে আমরা আত্মহারা হইয়া যাই; কিন্তু দুঃখের দিনে আপনাকে দেখিতে পাই ও ভগবানের বাণী শুনিতে পাই। আজ জাতির বিপদের দিনে এই জাতির যে আত্মা, তাঁহাকেই অনুসন্ধান করিব। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' কিন্তু এই বল কিসের বল? পাশব বলে আত্মাকে পাইব? এই বল প্রেমের বল। ইহাই মহাত্মা গন্ধীর বাণী, আর ইহাই সমগ্র ভারতের বাণী। এই বাণীকে সার্থক করিতে হইলে, সকল স্বার্থপরতাকে, সকল হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষকে বিসর্জ্জন করিতে হইবে। আমরা রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে কেন আন্দোলন করি? আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, রাউলাট আইন চলিলে আমাদের এই নব-জাগ্রত জাতিকে তাহার নিজের পথ ধরিয়া গড়িয়া তুলিতে বাধা প্রাপ্ত হইব। সেই বাধা অতিক্রম করিতে হইলে, সকল হিংসাদ্বেষ বর্জ্জন করিয়া দেশ-প্রেমকে জাগাইয়া রাখিতে হইবে। তাই মহাত্মা গন্ধী বলিয়াছেন, "শত্রুকে ঘৃণা, হিংসা করিবে না; কারণ-প্রেমের জয় অনিবার্য্য।"

চিত্তরঞ্জন মহাত্মা গন্ধীর 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলন শিরোধার্য্য করিলেন, অথচ অহিংস অসহযোগমন্ত্র গ্রহণ করিলেন না। সে সময়ে বিশেষ কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন বহুদেশবাসীর বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা অনেকে আগ্রহান্বিতচিত্তে শুনে নাই, পরন্তু তিনি "মিঃ গন্ধী" বলিয়া মহাত্মাজীকে আখ্যা দিলে সহস্র সহস্র শ্রোতা সমস্বরে বলিয়া উঠেন, "বল, মহাত্মা গন্ধী।" চিত্তরঞ্জন লোকরঞ্জন ছিলেন, অথচ এই লোকপ্রিয়তা-রক্ষার খাতিরে সত্য ধারণাকে বিসর্জ্জন দিলেন না। ইহাই চিত্তরঞ্জনের বিশেষত্ব। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি আপনার বিবেককে বুঝাইয়া সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মহাত্মা গন্ধীর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবান্ হইলেও চিত্তরঞ্জন মুহূর্ত্তের জন্য সঙ্কল্পচ্যুত হন নাই, বিবেককেও বলিদান দেন নাই।

এ সম্বন্ধে তাঁহার পারিবারিক জীবনের একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। চিত্তরঞ্জন নিজের বিবেকবুদ্ধি অনুসারে মনে জ্ঞানে আপনাকে প্রকৃত হিন্দু-বৈষ্ণব বলিয়া জানেন। অথচ তিনি বহু হিন্দুনৈষ্ঠিক আচার-ব্যবহার নিজের বিবেকবুদ্ধির বিরুদ্ধবাদী বলিয়া মানিতেন না। তিনি জাতিভেদ মানেন না বলিয়া স্বয়ং বৈদ্যবংশজ হইয়া বেদোক্তবিধানে ব্রাহ্মণ-কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠা কন্যাকে কায়স্থ পাত্রের হস্তে দিয়াছেন এবং পুত্র চিররঞ্জনের বিবাহ দিয়াছেন পশ্চিম-বঙ্গের বৈদ্যসমাজের কোনও বংশে। কিন্তু দুই বিবাহই দিয়াছেন তিনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের ব্যবস্থা-মতে। জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহে তিনি ব্রাহ্মণ-পুরোহিত পর্য্যন্ত আনিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কারণ, তিনি ব্রাহ্মণের জাতিগত প্রাধান্য মানিতেন না। অথচ পত্নী বাসন্তী দেবী নিষ্ঠাবান্ হিন্দু শাস্ত্রাচারীর মত ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের সাহায্যে কন্যার উদ্বাহক্রিয়া নিষ্পন্ন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। এই বিষয় লইয়া স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে বহু তর্ক-বিতর্ক হয়। চিত্তরঞ্জনের নিকটাত্মীয় সুকুমারবাবু বলেন, অনেকক্ষণ তর্কের পর চিত্তরঞ্জন সেখান হইতে উঠিয়া যান। অনেক রাত্রে শয্যায় স্বামীকে

না দেখিয়া বাসন্তী দেবী তাঁহাকে খুঁজিতে যান এবং ছাদে তাঁহাকে একাকী সেই গভীর রাত্রে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতে দেখেন। চিত্তরঞ্জন গভীর চিন্তায় মগ্ন, তাঁহার মুখমণ্ডলে চিন্তারেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে; ক্ষণ পরে উত্তেজনাবশে চিত্তরঞ্জনের চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। বাসন্তী দেবী তখন স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, 'দেখ, ভাল করিয়া বুঝ। তুমি সমাজ ত ভাঙ্গিতে চাহ না, সমাজের সংস্কার করিতে চাহ। এই হেতু ক্রমে উঠা আবশ্যক। এখন ব্রাহ্মণ-পুরোহিত বাদ দিয়া মেয়ের বিবাহ দিলে কেহ ঐ আদর্শ লইবে না, কেন না, এখনও সমাজ সে জন্য প্রস্তুত হয় নাই। এখন যেটুকু করিতেছ, তাহাই যথেষ্ট। জাতিভেদ না মানিয়া কন্যার বিবাহ দিতেছ, হয় ত কেহ কেহ এ আদর্শ মানিয়া লইতে পারে। কিন্তু একবারে সবটা করিতে গেলে তোমার উদ্দেশ্য পণ্ড হইতে পারে।' পত্নীর এই কথায় কে যেন চিত্তরঞ্জনের অন্ধকারময় মনে আলোক আনিয়া দিল। চিত্তরঞ্জন পত্নীর কথাই শুনিলেন, ব্রাহ্মণ-পুরোহিত আনাইয়া কন্যার বিবাহ দিলেন।

চিত্তরঞ্জন মহাত্মা গন্ধীর গুণমুগ্ধ, দেশের প্রতিও পরম অনুরাগী। অথচ যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি মনে ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই যে, বর্ত্তমান বুরোক্রাটিক ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতাবর্জ্জন না করিলে দেশ স্বাবলম্বী হইতে পারিবে না, বা, ইংরেজের মনে জাতীয় সমতার ভাব জাগাইতে পারিবে না, অথবা স্বরাজের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না, ততক্ষণ তিনি কিছুতেই মহাত্মা গন্ধীর প্রস্তাবিত অহিংস অসহযোগনীতি গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। বরং তিনি বরাবরই ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা দ্বারা স্বায়ত্তশাসন লাভ করিবার জন্য নিজের শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

চিত্তরঞ্জন এক সময়ে য়ুরোপীয়ানদের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "যদি শ্বেতাঙ্গগণ এ দেশে আসিয়া বাস করিতে চাহেন, তাহা হইলে আমরা ভারতের উন্নতিসাধনের জন্য তাঁহাদিগের সহিত একত্রে কার্য্য

করিব।” কিন্তু তাহা বলিয়া চিত্তরঞ্জন কোনও কালে পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রাধান্য বা ইংরেজের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতে সম্মত ছিলেন না। ১৯১৭ সালের বাঙ্গালা প্রাদেশিক কনফারেন্সের বৈঠকে সভাপতিরূপে চিত্তরঞ্জন বজ্রনাদে ঘোষণা করিয়াছিলেন,—“আমরা আহারে, ব্যবহারে, আচারে, বিচারে, ভাষায়, ভাবে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, সমস্ত জীবনক্ষেত্রে প্রতিপাদবিক্ষেপে বিলাতের অনুকরণ করিয়াছি। মন্দিরের বদলে সভা করিয়াছি, সদাব্রতের বদলে হোটেল করিয়াছি, থিয়েটার করিয়া আনন্দের মূল্য দুর্ভিক্ষে দান করি, লটারী করিয়া অনাথ-আশ্রমের চাঁদা তুলি; দেশে যত রকমের স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার সহজ উপায় ছিল, তাহার বদলে বিলাতী খেলা আমদানী করিয়াছি. অর্থোপার্জ্জন যে আমাদের জীবনযাপনের উপায় মাত্র, তাহা ভুলিয়া গিয়া বিলাতী industrialism এর নকল করিয়া অর্থ উপার্জ্জনের জন্যই জীবন-যাপন করিবার চেষ্টা করিতেছি।” চিত্তরঞ্জন এই পাশ্চাত্য প্রভাবের অপকারিতা শতবার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে; বহুবার বলিয়াছেন, আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ভিতর দিয়া আমাদের জাতীয় উন্নতি-সাধন করিতে হইবে। তবে সে উন্নতি ইংরেজকে বর্জ্জন করিয়া করিতে হইবে, এমন কথা চিত্তরঞ্জন বলেন নাই! তিনি বলিয়াছেন, যে ইংরেজ এ দেশকে কেবল কামধেনু বলিয়া বুঝিবে ও তদনুরূপ কার্য্য করিবে, তাহাকে ভারতবাসী চাহে না, যথাঃ—“কিন্তু যদি শুধু অর্থ উপার্জ্জন করিতে তাঁহারা (শ্বেতাঙ্গগণ) আসিয়া থাকেন, এবং কেমন করিয়া অধিক উপার্জ্জন হইবে, ইহাই যদি তাঁহাদের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে তাঁহারা ভারতের বন্ধু নহেন, আপনাদিগকে ভারতবাসী বলিবার অধিকার তাঁহাদের নাই এবং এদেশবাসীকে স্বায়ত্তশাসন দিতে বাধা দিবারও অধিকার তাঁহাদের নাই। শ্বেতাঙ্গরা যদি ভারতে থাকা ক্ষতিকর মনে করেন, তবে তাঁহারা ভারত হইতে চলিয়া যাইতে পারেন, আর যদি থাকা লাভজনক মনে করেন, তবে থাকুন, কেহ আপত্তি করিবে না।”

এ দেশে অনেক প্রবাসী ইংরেজ ভারতবাসীর মুখের উপর যখন তখন তরবারি আস্ফালন করিয়া থাকেন, বলেন,—'আমরা ইংরেজরা তরবারির দ্বারা ভারত জয় করিয়াছি, তরবারির দ্বারা রক্ষাও করিব। ভারতবাসী নিকৃষ্টজাতি, আত্মরক্ষায় অশক্ত, আমরা রক্ষা করি, অথচ এত বড় অকৃতজ্ঞ যে, স্বায়ত্তশাসন চায়, লম্বা-চৌড়া অধিকারের দাবী করে, ইত্যাদি।" বস্তুতঃ প্রয়াগের 'পাইওনিয়ার' পত্র একবার ইংরেজের Tiger qualities এর ভয় দেখাইয়া তরবারি আস্ফালন করিয়াছিলেন। কলিকাতার এ্যাংলোইণ্ডিয়ানদের এক দলপতি—নাম মিঃ আর্ডেন উড এক সভায় বলিয়াছিলেন, 'ভারতীয়কে ক্রমাগত অধিকার বাড়াইয়া দিলে এমন সময় আসিবে যে, আবার আমাদিগকে তরবারির দ্বারা ভারতকে পুনরায় জয় করিতে হইবে।' চিত্তরঞ্জন এ সকল কথা সহ্য করিতে পারিতেন না। ভারতবাসীরা কৃতজ্ঞ নহে, এ কথার উত্তরে চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন,"আমাদের যা স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতা,তাহা আমাদের চিরকালই আছে। কিন্তু এই কৃতজ্ঞতার আর একটা দিক্ আছে, তাহা যেন ইংরেজ ভুলিয়া না যান। এ দেশে আসিয়া রাজত্ব-বিস্তার করিয়া কি ইংরেজের কোন লাভ হয় নাই? * * * সমগ্র মানব-সমাজে যে ইংরেজ আজ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, তাহাতে কি বাঙ্গালার ও তথা সমস্ত ভারতবর্ষের কোন হাতই ছিল না? এই যে কৃতজ্ঞতা, ইহা কি শুধু আমাদেরই? ইংরেজের কৃতজ্ঞ হইবার কি কোনও কারণ নাই? * * * আমাদের যে নিজের হাতে নিজের কাজ করিবার নিতান্ত ন্যায়সঙ্গত আকাঙ্ক্ষা, সে আকাঙ্ক্ষা যদি পূর্ণ না কর—এই সামান্য অধিকার যদি আমাদের না দাও, তবে তোমাদের কৃতজ্ঞতার কোনও অর্থ নাই।"

ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, চিত্তরঞ্জনের মনের ভাব কিরূপ। চিত্তরঞ্জন ইংরেজের অহমিকতা সহ্য করেন না বটে, ইংরেজকে ভারতবাসীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে বলেন বটে, তথাপি ইংরেজকে বর্জ্জন করিবার

বা ইংরেজের সহিত সহযোগিতা বর্জ্জন করিবার কথা বলেন নাই ; আর্ডেন উডের তরবারি আস্ফালনের কথাতেও চিত্তরঞ্জন ইংরেজকে ছাড়িয়া কথা কহেন নাই :—"মিঃ আর্ডেন উডের যেন স্মরণ থাকে, ভারত কখনও অস্ত্রের দ্বারা জয় করা হয় নাই,কেবল প্রীতির দ্বারা এবং ভারতকে সুশাসনে রাখিবে, এই প্রতিশ্রুতির দ্বারা ইংরেজ ইহাকে লাভ করিয়াছে। ভারতকে কখনও অস্ত্রের দ্বারা জয় করা হয় নাই ; ভগবান্ ইচ্ছা করিলে কেহ কখনও করিতে পারিবে না।"

এইরূপে চিত্তরঞ্জন ইংরেজকে কখনও শ্রেষ্ঠের আসন দান করেন নাই, তবে কখনও বর্জ্জনও করেন নাই। তাঁহার মনের ভাব এই কয়টি কথাতে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে :—

"অবশ্য, য়ুরোপীয় সভ্যতাকে আমি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকি,আমার শিক্ষা-দীক্ষার জন্য আমি য়ুরোপের নিকট কৃতজ্ঞ ; কিন্তু তাহা হইলেও আমি ভুলিতে পারি না যে, য়ুরোপীয় রাজনীতির ধার-করা জিনিস লইয়া আমাদের জাতীয়তা সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না।"

পাঠক, ইহার সহিত মহাত্মা গন্ধীর উপদেশের সামঞ্জস্য দেখিতে পাইবেন। মহাত্মা গন্ধীও কোনদিন ইংরেজ-বিদ্বেষী নহেন, তথাপি তিনি আপনার বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়া জাতিকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে বার বার উপদেশ দিয়াছেন। অথচ চিত্তরঞ্জন কলিকাতার বিশেষ কংগ্রেসে মহাত্মা গন্ধীর প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিতে আগ্রহান্বিত হন নাই, কেন না, তখনও তিনি সহযোগিতা দ্বারা কার্য্যসাধনের আশায় নিরাশ হন নাই। তিনি চাহেন,—"আমরা আমলাতন্ত্র চাহি না, আমরা চাই স্বায়ত্তশাসন। এই স্বায়ত্তশাসনে দেশের লোকেরই কর্তৃত্ব থাকিবে এবং উহা দেশের লোকের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইবে—ইহাতে প্রবলপ্রতাপান্বিত জমীদার হইতে নিঃস্ব প্রজা পর্য্যন্ত সকলেরই অধিকার থাকিবে।" অথচ ইংরেজের সহানুভূতিচ্যুত হইতে চাহেন নাই, বলিয়াছিলেন ;—

"বিলাতের প্রধান মন্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, শুধু অর্থনীতির দিক্ দিয়া,

নয়, রাজনীতির দিক দিয়াও ভারতের পুনর্গঠন একান্ত আবশ্যক। সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কেবল ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকিবে না, ইহার প্রত্যেক খণ্ড স্বায়ত্তশাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম ও ভাষা বিভিন্ন হইলেও এই স্বায়ত্তশাসনের দ্বারা পরিচালিত খণ্ড-রাজ্যগুলি এক বিশাল গণতন্ত্র সাম্রাজ্যে সংযুক্ত থাকিবে।"

গঠন-প্রণালী

চিত্তরঞ্জন চিরদিনই ধ্বংসকার্য্যের মন্ত্র প্রচার করেন নাই। ইংরেজের সহিত সহযোগিতা করিয়া কি ভাবে দেশে স্বায়ত্তশাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে, তাহা তিনি ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক বৈঠকের সভাপতিরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার কথা এই:—"জনসংখ্যা ও কার্য্যের সুবিধা অনুসারে কতকগুলি গ্রাম লইয়া এক একটী পল্লী বা গ্রাম্য-সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই সব গ্রামের ১৬ বৎসরের যুবক হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ণধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলেই এই সমাজভুক্ত হইবে। তাহারা সকলে মিলিয়া পাঁচজন পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন করিবে। এই পঞ্চায়েতের উপর ঐ সকল গ্রামের সমস্ত কার্য্য—সমস্ত শুভাশুভের ভার অর্পিত হইবে। তাঁহারা গ্রামের পথ-ঘাটের ব্যবস্থা করিবেন। গ্রামের স্বাস্থ্য কি করিয়া রক্ষা করা যায়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবেন। তাঁহারা গ্রামে পূর্ব্বেকার যাত্রা, গান ইত্যাদি চালাইবার চেষ্টা করিবেন। নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষার বিস্তার করিবেন। চাষীকে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে আবশ্যকমত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবেন। তাঁহারাই আবশ্যক পুষ্করিণী খনন করাইবেন ও পুরাতন পুষ্করিণী সংস্কার করাইবেন। সমস্ত গ্রামগুলি যাহাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, তাহা দেখিবেন। চাষীরা যাহাতে বারমাস পরিশ্রম করিয়া নিজেদের আবশ্যক দ্রব্যগুলি প্রস্তুত করিতে পারে, ও অন্যান্য শিল্প-পণ্য উৎপন্ন করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে তাহাদিগকে শিক্ষা

দিয়া এই সব কার্য্যের উপায় করিয়া দিবেন। এই পল্লী-সমাজ প্রতি পল্লীতে একটি সাধারণ ধান্যাগার স্থাপন করিবেন। প্রত্যেক গৃহস্থ চাষীমাত্রেই সেই ধান্যাগারে তাহাদের ক্ষেতের ফসল কিছু কিছু করিয়া দিবে। পল্লী-সমাজ সেই ধান্যাগার যাহাতে সুরক্ষিত থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। যখন অজন্মা, দুর্ভিক্ষ বা বীজের জন্য ধান্যের অভাব হইবে, তখন পল্লীসমাজ চাষীদের প্রয়োজনমত হিসাব করিয়া ধার দিবেন। পরে আবার ফসল হইলে তাহার সেই পরিমাণ ধান্য ধান্যাগারে পূরণ করিয়া দিবে।

"এই সব গ্রামবাসীদের মধ্যে কোন কলহ অথবা ছোটখাট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে উক্ত পঞ্চায়েতই তাহার নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন এবং বড় ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমা তদন্ত করিয়া সবডিভিসন ও জেলার আদালতে পাঠাইয়া দিবেন। তাঁহাদের সেই তদন্ত-বিবরণই সব আদালতে নালিশ ও আর্জ্জী বলিয়া গৃহীত হইবে।

"এইরূপে প্রত্যেক জেলার জনসংখ্যা অনুসারে ২০টি ২৫টি পল্লীসমাজ থাকিবে। এই প্রত্যেক পল্লীসমাজে পাঁচজন পঞ্চায়েত ব্যতীত জেলা-সমাজের জনসংখ্যা অনুসারে পাঁচ হইতে পাঁচশটি পর্য্যন্ত সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন। এই পল্লী-সমাজের নির্ব্বাচিত সভ্য লইয়া জেলা-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রত্যেক পল্লী-সমাজ এই জেলা-সমাজের অধীনে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। এই জেলা-সমাজ—

(১) সেই জেলাভুক্ত সকল পল্লী-সমাজের কার্য্য তদন্ত করিবে।

(২) সকল পল্লী-সমাজের শিক্ষা-দীক্ষার কার্য্য যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, তাহার উপায় করিয়া দিবে ও জেলার রাজধানী, তাহার শিক্ষাদীক্ষার ভার লইবে।

(৩) কৃষিকার্য্য ও কুটীর-শিল্পের যাহাতে উন্নতি ও প্রসার হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়া কার্য্যে পরিণত করিবে।

(৪) সকল পল্লীসমাজের অধীন সেই সব গ্রাম তাহার স্বাস্থ্য

সম্বন্ধে তদন্ত করিবে ও সকল পল্লীসমাজ সেই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সৎপথে চালাইয়া লইবে। ইহা ব্যতীত জেলার যে সহর বা রাজধানী, তাহারও স্বাস্থ্যরক্ষার ভার জেলাসমিতির অধীন থাকিবে।

(৫) জেলার মধ্যে কোন্ কোন্ দ্রব্যের ব্যবসাবাণিজ্য চলিতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া ও উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচন করিয়া ছোটখাট ব্যবসা চালাইতে হইবে।

(৬) এই জেলা-সমাজ একজন সভাপতি নির্ব্বাচন করিবে, প্রত্যেক বিষয়ের জন্য ভিন্ন সভা গঠিত করিবে। কিন্তু প্রত্যেক সভাই এই জেলা-সমিতির অধীনে কার্য্য করিবে।

(৭) জেলার কৃষিকার্য্য, কুটীর-শিল্প ও অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য, অর্থের সুবিধার জন্য একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই ব্যাঙ্কের শাখা প্রত্যেক পল্লী-সমাজেই এক একটি করিয়া থাকিবে। চাষীরা মহাজনদের নিকট হইতে দাদন না লইয়া এই ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইবে এবং তাহারা যাহাতে খুব কম সুদে টাকা ধার পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ব্যাঙ্ক যাহাতে জেলার সকলের সমবেত চেষ্টার দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৮) জেলা ও পল্লী-সমাজের কোনও কার্য্যেই গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারী সংশ্লিষ্ট থাকিবেন না।

(৯) জেলা-সমাজ ও পল্লী-সমাজের সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য ব্যাঙ্ক বসাইয়া আবশ্যক টাকা উঠাইবার ক্ষমতা জেলা-সমাজের হস্তে নিহিত থাকিবে।

(১০) পল্লী-সমাজ ও জেলা-সমাজের এই সমস্ত কার্য্যপ্রণালী স্থিরীকরণ করিবার জন্য ও ক্ষমতা দিবার জন্য আবশ্যক আইন করিতে হইবে।"

নাগপুরে মত-পরিবর্ত্তন

সুতরাং দেখা যাইতেছে, চিত্তরঞ্জন জাতির নিজের মধ্য দিয়া জাতির বৈশিষ্ট্য গড়িয়া তুলিবার বিশেষ পক্ষপাতী। অথচ তিনি ইংরেজ ব্যুরো-ক্রেশীর সহিত সহযোগিতাবর্জ্জনের কথা উল্লেখ করেন নাই। কলিকাতার বিশেষ কংগ্রেসের অধিবেশনকালে তিনি মহাত্মা গন্ধীর সহযোগিতা-বর্জ্জন-নীতির প্রতিবাদই করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাত্মা গন্ধীর অসহযোগের বিপক্ষে এক সংশোধক প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন, উহাতে বিলাতের প্রধান মন্ত্রীর নিকট ভারতের কথা বলিবার উদ্দেশ্যে ভারতীয়গণের দৌত্য প্রেরণ করিবার কথা ছিল। ডাক্তার কিচলু মহাত্মা গন্ধীর প্রস্তাব সমর্থন করেন, কিন্তু মিসেস বেসাণ্ট আপত্তি করেন। শেষে ভোটের আধিক্যে মহাত্মা গন্ধীর প্রস্তাবই গৃহীত হয়। ঐ বিশেষ কংগ্রেসে স্বয়ং সভাপতি লজপৎ রায়, চিত্তরঞ্জন, বিপিনচন্দ্র পাল, মিসেস বেসাণ্ট প্রভৃতি গণ্যমান্য লোক মহাত্মাজীর প্রস্তাবের বিপক্ষে থাকিলেও, প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর দেশে নবভাবের বন্যা বহিতে আরম্ভ করে। প্রয়াগে বিখ্যাত ব্যবহারাজীব জন-নায়ক পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ওকালতী ত্যাগ করিলেন এবং দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন।

চিত্তরঞ্জন চিরদিনই সহযোগিতার পক্ষপাতী, এ কথা বলিয়াছি। কিন্তু পঞ্জাবের অনাচারের তদন্তের জন্য কংগ্রেসের নিযুক্ত কমিটীর সদস্যরূপে পঞ্জাবের বিসদৃশ ব্যাপারের সাক্ষ্য শুনিয়া অবধি তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠে। (পঞ্জাবী ব্যাপারের অনুসন্ধানের জন্য কংগ্রেস যে কমিটী নিযুক্ত করেন, চিত্তরঞ্জনও মহাত্মা গন্ধী, আব্বাস তয়াবজী ও জয়াকরের মত সেই কমিটীর সদস্য হইয়াছিলেন।) কিন্তু মন চঞ্চল হইয়া উঠিলেও তিনি সহযোগিতার আস্থা হারান নাই। কলিকাতার কংগ্রেসে তাই তিনি অসহযোগের বিপক্ষে বলিয়াছিলেন।

তাহার পর ঐ বৎসরই ডিসেম্বর মাসে নাগপুরের কংগ্রেস। সেই

শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী ।

কংগ্রেসে বাঙ্গালা মহাত্মাজীর অসহযোগ প্রস্তাবের প্রতিকূলে ভোট দিবে বলিয়া কথা উঠিল। এমন কি, জনরব রটিল, চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালা হইতে ২০০ 'গুণ্ডা' ডেলিগেট ভাড়া করিয়া অসহযোগ প্রস্তাবের মুণ্ডপাত করিতে যাইতেছেন। নাগপুর কংগ্রেসের সভাপতি মাদ্রাজের বিজয়রাঘবাচারিয়া মহাত্মার প্রস্তাবের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। বাঙ্গালার ডেলিগেট ক্যাম্পে এই প্রস্তাব লইয়া ভাটিয়া ও গুজরাটীদের সহিত হাতাহাতিও হইয়া গেল। কিন্তু মহাত্মা গন্ধীর প্রস্তাবই গৃহীত হইল এবং সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার কথা, চিত্তরঞ্জন সহযোগ-নীতি পরিত্যাগ করিয়া মহাত্মাজীর অসহযোগনীতি অবলম্বন করিলেন, যিনি অসহযোগ প্রস্তাবের প্রধান বিরুদ্ধবাদী হইয়া কংগ্রেসের কার্য্য-তালিকা হইতে 'অসহযোগ' শব্দ মুছিয়া ফেলিতে গিয়াছিলেন, তিনিই অসহযোগে দীক্ষিত হইয়া ঘরে ফিরিলেন! ইহার অপেক্ষা মহাত্মা গন্ধীর প্রভাবের অথবা চিত্তরঞ্জনের চরিত্রমাহাত্ম্যের আর কি প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে! শুনা যায়, মহাত্মাজী বহুক্ষণ ধরিয়া চিত্তরঞ্জনকে অসহযোগের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেন। চিত্তরঞ্জন একেই পঞ্জাবের ব্যাপারে চঞ্চল হইয়াছিলেন, তাহার উপর মহাত্মাজীর সংস্পর্শ,—এই দুই ঘটনা-স্রোত তাঁহার পূর্ব্বের সঙ্কল্প ভাসাইয়া দিল। যে যুগাবতার সত্যসন্ধ মহাত্মা গন্ধী বলিয়া থাকেন, stricke, but hear me, তাঁহার অদ্ভুত যুক্তিতর্কের মহিমায় চিত্তরঞ্জন যখন একবার নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, তখন মুহূর্ত্তমাত্র দ্বিধা করিলেন না, একবারে পূর্ণ অসহযোগী হইলেন; তাঁহার নিকট half way নাই। যেমন কন্যার বিবাহকালে পত্নী বাসন্তীদেবীর মুখে একটা পরামর্শের কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'তুমি আমার সংশয়-অন্ধকারে আলো আনিয়া দিলে.' তেমনই নাগপুরে মহাত্মার উপদেশে তিনি আলো দেখিতে পাইলেন, তাঁহার সংশয়াকুল চঞ্চল মন শান্ত হইল।]

বরিশাল কনফারেন্স

অহিংসা অসহযোগ ব্রত একবার গ্রহণ করিবার পর চিত্তরঞ্জন বসিয়া

থাকিবার লোক নহেন। তিনি কথায় অসহযোগ মন্ত্র প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। যখন বুঝিলেন, বর্ত্তমান আমলাতন্ত্র-শাসনের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ না করিলে ব্রত সফল হইবে না, যখন বুঝিলেন, নিজ চরিত্রে এ ব্রতের ত্যাগ মাহাত্ম্য দেখাইতে না পারিলে দেশ তাঁহার কথা লইবে না, তখন একদিনে তিনি রাজার রাজ্যের আয়ের পেশা ছাড়িয়া দিলেন, আমিরী ছাড়িয়া ফকিরী গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ত্যাগে দেশ বিস্ময়-পুলকিত-নয়নে তাঁহার বিরাট ত্যাগের মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া রহিল। শুনিয়াছি, সেই বিরাট ত্যাগে বিস্মিত হইয়া য়ুনিভার্সিটি কমিশনের সভাপতি স্যার মাইকেল স্যাডলার বলিয়াছিলেন, "চিত্তরঞ্জনের অদ্ভুত ত্যাগ জগতের ইতিহাসে অতুলনীয়; কোনও দেশে কোনও সময়ে কেহ এত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দেশের কাজে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে নাই।' ভারতবাসী তাঁহার অনুকরণ করিতে পারিলে ধন্য হইবে।" ব্যারিষ্টারী ছাড়িয়া দিয়া চিত্তরঞ্জন সামান্য বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া সামান্যভাবে থাকিয়া দেশে ত্যাগ ও অসহযোগ-মন্ত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দেশ যেন ভগবানের প্রেরণায় প্রস্তুত হইয়াছিল। তাই যেখানেই চিত্তরঞ্জন পদার্পণ করেন, সেখানেই দেশবাসীর প্রাণের সাড়া পান। তাঁহার জন্য বাঙ্গলার পল্লী মফঃস্বল যে বিপুল সংবর্দ্ধনার আয়োজন করিয়াছিল, তাহা কোনও রাজা-মহারাজের ভাগ্যে কখনও ঘটিয়াছেকি না সন্দেহ। চিত্তরঞ্জন তাঁহার বিরাট ত্যাগে দেশবাসীর হৃদয় জয় করিয়া ফেলিলেন। নারায়ণগঞ্জে চিত্তরঞ্জনের ডাকে এক জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, ঢাকার অধ্যাপক সতীশচন্দ্রের উদ্যোগে জাতীয় বিদ্যাপীঠ গঠিত হইল। তাহার পর ময়মনসিংহে যখন জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট নগরে চিত্তরঞ্জনের প্রবেশ নিষেধ করিয়া দিলেন, তখন সমগ্র বঙ্গদেশ যেন এক হইয়া উঠিল, চিত্তরঞ্জনের জয়রবে বাঙ্গালার গগন পবন মুখরিত হইয়া উঠিল। চিত্তরঞ্জন কেবল কংগ্রেসের আদেশ পান নাই বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম অমান্য করিয়া আইন ভঙ্গ করিলেন না, ময়মনসিংহ হইতে

চলিয়া আসিলেন। সেই সময়ে চিত্তরঞ্জন জলদগম্ভীরনাদে ঘোষণা করিলেন,—

"আমরা আমাদের নিজের দেশে কৃতদাসের মত ব্যবহার পাইতেছি, স্বরাজ না পাইলে জীবনধারণ মিথ্যা।"

ম্যাজিষ্ট্রেটের এই আদেশের ফলে অধিকাংশ পরীক্ষার্থী ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিল না, উকীল-মোক্তাররা ৭ দিন আদালত বর্জ্জন করিলেন। শেষে ম্যাজিষ্ট্রেট (উপরওয়ালার ইঙ্গিতে) আদেশ প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন। ময়মনসিংহ হইতে চিত্তরঞ্জন টাঙ্গাইলে আসিলেন। সেখানে প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র ঘোষ মোক্তারী ছাড়িয়া দেশের কাজে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহারই উদ্যোগে যে সভা হয়, তাহাতে চিত্তরঞ্জন যখন বক্তৃতা করেন, তখন পুলিশ রিপোর্টারও সেই বক্তৃতা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। টাঙ্গাইল হইতে চিত্তরঞ্জন করটিয়ায় যান। সেখানকার প্রসিদ্ধ জমীদার ওয়াজেদ আলি খাঁ পনি সাহেব ওরফে চাঁদ মিঞার বিশাল ভবনের প্রাঙ্গণে সভা হইল। সে সভায় চিত্তরঞ্জন মর্ম্মস্পর্শিনী বক্তৃতা দিয়া দরিদ্র কৃষককুলকেও দেশ-প্রেমে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। চাঁদ মিঞা এখন অমর ঘোষের ন্যায় জেলে।

তাহার পর চিত্তরঞ্জন একে একে মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম ইত্যাদি নানা স্থানে বক্তৃতা দিয়া ভাবের বন্যায় পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ভাসাইয়া দিলেন। তাঁহার সে সব বক্তৃতায় সুপ্ত বঙ্গদেশ জাগ্রত হইল। ভগীরথ যেমন স্বর্গ হইতে মন্দাকিনীর পুণ্যধারা মর্ত্ত্যে প্রবাহিত করিয়া মৃত সগরবংশকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন, তেমনই চিত্তরঞ্জন তাঁহার আন্তরিক স্বদেশপ্রেমের মন্দাকিনী-ধারায় বাঙ্গালার প্রাণশূন্য অকর্ম্মণ্য দেহে জীবনীশক্তির সঞ্চার করিলেন।

সমগ্র পূর্ব্ব-বাঙ্গালা এইরূপে মাতাইয়া দিয়া চিত্তরঞ্জন বরিশাল কনফারেন্সে উপস্থিত হইলেন। সেবার সেই প্রাদেশিক রাষ্ট্রসম্মেলনে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল সভাপতি এবং বরিশালের স্বনামধন্য জন-নায়ক

অশ্বিনীকুমার অর্ভ্যথনা-সমিতির সভাপতি। এই মহা সম্মেলনে বাঙ্গালা কোন্ পথ অবলম্বন করিবে, তাহা নির্ণীত হইবে, তাই এই সম্মেলনের বিশেষত্ব ছিল। এ গ্রন্থের রচয়িতা "বসুমতীর" প্রতিনিধিরূপে জাতির সেই মহাযজ্ঞের তীর্থে উপস্থিত ছিল, বরিশালের অন্যতম জননায়ক শরৎকুমার ঘোষের জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল, আর সভাপতি বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতায় বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্যরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা দেখিয়া তাঁহার ব্যথায় ব্যথা অনুভব করিয়াছিল। বাঙ্গালা তাহার বৈশিষ্ট্য চাহে নাই, সে সভায় বাঙ্গালী বিপিনচন্দ্রের স্বরাজের অপরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণ করে নাই, বাঙ্গালা তাহার প্রাণের মধ্য দিয়া মহাত্মা গন্ধীর অসহযোগব্রতের ডাকে সাড়া দিয়াছিল। আর সেই দ্বাদশ সহস্র শ্রোতার মাঝে দাঁড়াইয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যখন মহাত্মার বাণী প্রতিধ্বনিত করিয়া অহিংস অসহযোগ মন্ত্র গ্রহণের কথা উত্থাপন করেন, তখন সমগ্র সভামণ্ডলী মুক্তস্বরে জলদমন্দ্রে জানাইয়াছিলেন, "হাঁ, বাঙ্গালা অসহযোগই গ্রহণ করিবে।" স্বরাজের ব্যাখ্যায় দেশবন্ধু বলেন :—

"স্বরাজ দশের কথায় চলবে কি একের কথায় চলবে, জানি না। স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার, ভগবানের দান। তপস্যায় নিজেকে বোঝ, দেখবে, তুমি অন্তরে বাহিরে মুক্ত; অন্তরের এই মুক্তির আস্বাদ ৩০ কোটি মানুষ পেলেই তারা মুক্ত হবে। আগে অন্তরের এই মুক্তিধন; তার পর বাহিরে তার স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বাধীন রূপ। বিদ্যায়, বাণিজ্যে, বিচারে, শাসনে আমরা পরের মুখ চাই, এই ত মায়া। আমরা কাহারও শত্রু নই; আমরা মুক্তিকামী। এই আন্দোলন শান্তির যুদ্ধ। আমাদের মা-বোনকে কাপড় পরায় বিদেশী, এ লজ্জা কি রাখবার স্থান আছে?"

তাহার পর ষ্টীমারে রাত্রিকালে বিনিদ্র থাকিয়া দেশবন্ধু সামান্যবেশে যখন ডেলিগেট উকীলবাবুদের নিকট গিয়া প্রত্যেককে অনুনয়-বিনয় করিয়া, দেশের জন্য ত্যাগের প্রয়োজন মহিমা বুঝাইতে লাগিলেন, তখন চিত্তরঞ্জনের হৃদয়ের বিশালতা উপলব্ধি করিয়াছিলাম। কত উকীল

বাবু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিলেন, কত উকীলবাবু কঠোর কথা শুনাইয়া দিলেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। শুনিয়াছি, তিলক-স্বরাজ-ভাণ্ডারের অর্থসংগ্রহের জন্য চিত্তরঞ্জন নিজের পদগৌরব ভুলিয়া গিয়া সামান্য লোকেরও হাতে পায়ে ধরিয়াছেন! এমন না হইলে জন-নায়ক, এমন না হইলে দেশপ্রিয় দেশবন্ধু!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অসহযোগনীতি দেশে অবলম্বিত হইলে পর সরকার বিচলিত হইয়া উঠিলেন। একদিকে আত্মার বলে বলী অসহযোগী—অপরদিকে বাহু-বলে বলী বিরাট্ ব্রিটিশ সরকার, এই উভয় পক্ষে যে শক্তি-সংঘর্ষ আরম্ভ হইল, তাহা বস্তুতঃই বিস্ময়প্রদ। কি ভাবে কোথা হইতে এই সংঘর্ষ আরব্ধ হইল, তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করা এ রচনার উদ্দেশ্য নহে। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ক্রমে সেই সংঘর্ষ হইতে সরকারের কঠোর নীতি—যাহাকে অসহযোগীরা ধর্ষণ-নীতি আখ্যা দিয়াছেন - সেই কঠোর শাসন-নীতি উদ্‌গত হইল। যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলসের আগ-মন উপলক্ষে এ দেশে অসহযোগীরা যে হরতাল অনুষ্ঠান করেন, উহা হইতে এই ধর্ষণ-নীতির প্রবর্ত্তন হইল, ইহাই লোকমুখে ঘোষিত।

ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন

১৯২১ সালের ১৭ই নভেম্বর কলিকাতা ও তথা সমগ্র ভারতের পক্ষে এক চিরস্মরণীয় দিন। ঐ দিন ভারত-সরকারের আমন্ত্রণে যুবরাজ প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ ভারত পরিদর্শন করিতে বোম্বাই সহরে পদার্পণ করেন। যাঁহারা বর্ত্তমান আমলাতন্ত্র-সরকারের সহিত সহযোগিতা বর্জ্জন করিয়া-ছিলেন, তাঁহারা ঐ দিন সমস্ত ভারতবর্ষে হরতাল ঘোষণা করেন। তাঁহারা বলেন, যেহেতু পঞ্জাবের অনাচার, খেলাফতের ব্যথা ও স্বরাজের কামনার কথায় বর্ত্তমান সরকার কর্ণপাত করেন নাই, সেই হেতু সেই আমলাতন্ত্র-সরকারের নিমন্ত্রিত রাজ-অতিথির আহ্বানে ও অভ্যর্থনায় তাঁহারা যোগ-দান করিবেন না। উহাতে তাঁহারা রাজকীয় অতিথির প্রতি ব্যক্তিগত-ভাবে অথবা রাজবংশীয় হিসাবে কোনও অসম্মান প্রকাশের অভিপ্রায়

পোষণ করেন না। তবে ভারতবাসীর মনের ভাব জানিয়া, তাহাদের সহিত পরামর্শ না করিয়া, তাহাদের মতের বিরুদ্ধে রাজপুত্রকে এ সময়ে ভারতে নিমন্ত্রণ করিয়া আমলাতন্ত্র-সরকার নিজের অনুকূল উদ্দেশ্য-সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন বলিয়া, অসহযোগীরা রাজ-অভ্যর্থনা হইতে বিরত থাকিবেন।

ইহাই কংগ্রেসের ও খেলাফৎ কমিটীর আদেশ ছিল। সেই আদেশ অনুসারে বোম্বাই, কলিকাতা প্রভৃতি নানা স্থানে হরতাল হইল। বোম্বাইয়ে হরতালের সঙ্গে সঙ্গে শোচনীয় দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়াছিল। উহা নিশ্চিতই ভারতের পক্ষে কলঙ্কের কথা। কিন্তু কলিকাতার হরতালে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটে নাই। ঐ দিন সমগ্র কলিকাতা সহরে যাহা দেখা গিয়াছিল, এমন কখনও দেখা যায় নাই। হরতালের ফলে সমস্ত সহর যেন প্রাণহীন শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। খেলাফৎ ও কংগ্রেস স্বেচ্ছা-সেবকরা সহরের পথে শান্তিরক্ষা করিয়াছিল। রেলের যাত্রী পুত্র-পরি-বার লইয়া ষ্টেশনে নামিলে গাড়ী ও কুলীর অভাবে বিপদ্গ্রস্ত হইলে ভলাণ্টিয়াররা "ন্যাশানাল সার্ভিস" মার্কামারা গাড়ী করিয়া তাঁহাকে সপরিবারে গন্তব্য স্থানে পৌছাইয়া দিয়াছিল, নিজেরা মাথায় করিয়া যাত্রীর মোটঘাট বহিয়াছিল।

সেই আশ্চর্য্য বন্দোবস্তে সহরের য়ুরোপীয়ান মহল বিস্মিত, বিচলিত, স্তম্ভিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। তাঁহাদের সংবাদপত্রে সরকারকে ধিক্কার দিয়া গরম গরম প্রবন্ধ ও পত্রাদি লিখিত হয়,—সরকার কি নিজের কর্ত্তৃত্ব-ভার খেলাফতি গুণ্ডাদের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন? য়ুরোপীয়ান সদাগর সভাসমূহ 'গেল রাজ্য গেল মান' রবে গর্জ্জন করিয়া উঠেন। এ দেশের যাঁহারা গাড়ী চড়িতে বা অন্যরূপ অধিকার ভোগ করিতে ঐ একটি দিন বাধা পাইয়াছিলেন, তাঁহারাও বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া সরকারকে চণ্ডনীতি চালাইতে উত্তেজিত করেন।

ইহারই পরে ২৫শে নভেম্বর ৯ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার অপরাহ্ণে বাঙ্গালার

ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন হইল। প্রথমেই বাঙ্গালার গবর্ণর লর্ড রোণাল্ডসে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও হরতালের দিনের ঘটনা বর্ণনা করেন। পরন্তু তিনি অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা নিবারণের জন্য যে সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার সমর্থন করেন। তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম এইরূপ :—

গভর্ণরের বক্তৃতা

যদ্যপি আইন অমান্যকারীর দল সত্য সত্যই এইভাবে আইন ও শৃঙ্খলা উড়াইয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট তাহা রোধ করিবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিবেন বা করিতে বাধ্য হইবেন, সে সম্বন্ধে আমি বিশদভাবে অদ্য কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না। আমি আশা করি, অচিরেই তাঁহাদিগের সুবুদ্ধি হইবে। সুতরাং আমি অদ্য সাধারণভাবে গুটিকতক কথা বলিব। সাধারণ লোকে যেন এ কথাটি না ভোলেন যে, গভর্ণমেণ্টের যেমন দেশের লোকের প্রতি কর্ত্তব্য আছে, দেশের লোকেরও তেমনি গভর্ণমেণ্টের প্রতি এবং বিশেষভাবে তাহাদের নিজের প্রতি কর্ত্তব্য রহিয়াছে। সাধারণের সহযোগিতা ব্যতীত পৃথিবীর কোন পুলিশই সুচারুরূপে তাহাদের কর্ত্তব্য পালন করিতে পারে না। দেশের লোক যদি ভয় পাইয়া পুলিশের নিকট আদৌ অভিযোগ না করেন, তাহা হইলে পুলিশের পক্ষে তাঁহাদিগকে সাহায্য করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। রাজভক্ত প্রজামাত্রেরই কর্ত্তব্য যথাসময়ে পুলিশকে কাজে-কলমে সাহায্য করা। অধুনা কিন্তু এই চেষ্টার বৈপরীত্যই অনেকের মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে। নিশ্চয়ই তাঁহারা ইচ্ছা করেন না যে, দেশময় অরাজকতা বিরাজ করে; কিন্তু তথাপি তাঁহাদের কার্য্যাবলী দ্বারা বে-আইনী কাজের মাত্রা বাড়িয়া যাইতেছে এবং পুলিশের কার্য্যেও ব্যাঘাত ঘটিতেছে। প্রকৃষ্ট কারণ ব্যতীত কারণাভাবেও ধর্ম্মঘটে উৎসাহ দান এবং সেদিনকার ট্রামধর্ম্মঘটের কথা ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লিখিত হইতে

পারে। সত্য সত্যই যদি এই ধর্ম্মঘট অন্নকষ্টহেতু হইত, তাহা হইলে সরকার নিজে একটি শালিসী বোর্ড (Concilation board) নিযুক্ত করিয়া গোল মিটাইয়া দিতেন, কিন্তু তাহা মোটেই নহে, এবং যাহারা অকারণ এই ভাবে ধর্ম্মঘটের প্রশ্রয় দেয়, তাহাদের বিবেকের নিকট তাহারা দায়ী। যাঁহারা আইনসঙ্গত উপায়ে আপনাপন কারকারবার চালাইতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে সরকার সর্ব্বতোভাবে বাধ্য, এবং তাহা করিতে হইলেই পুলিশের উপর কতকগুলি অতিরিক্ত কার্য্যের ভার দিতে হইবে। ব্যয়বাহুল্য হওয়া সত্ত্বেও পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ভিন্ন গত্যন্তর থাকিবে না। ইহা ব্যতীত আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা পুলিশ কোন দাঙ্গাহাঙ্গামা নিরস্ত করিতে প্রয়াস পাইলেই, পুলিশকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে দোষী ও দাঙ্গাকারীদের নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিয়া লন—ইহাতে পুলিশের কার্য্যশক্তি ক্ষুন্ন হয়। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ এই মাসের প্রথমে হাওড়ায় যে হাঙ্গামা হয়, তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহারা এ ক্ষেত্রে দাঙ্গাকারীদিগকে কেবল যে ক্ষতিগ্রস্ত ও নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা নহে, ম্যাজিষ্ট্রেট এই গোলমালের কারণান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে যাহাতে কোন লোক তৎসমক্ষে সাক্ষী দিতে না যায়, তাঁহারা তদ্রূপ চেষ্টা করিয়া বিচারককে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছেন। আমি এই সমস্ত লোককে গুরুতর ভাবে সাবধান করিয়া দিতেছি যে, তাঁহারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারেই হউক, তাঁহাদের কার্য্যদ্বারা অরাজকতার পথ পরিষ্কার করিতেছেন। ইতিহাসপাঠান্তে একটু অনুধাবন করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, প্রায়শঃ যে সমস্ত লোক সামান্য অশান্তির বীজ বপন করে, পরিশেষে তাঁহাদিগের মহা অশান্তির বেগ সামলাইতে হয়—অনেকেই ভ্রান্ত হইয়া ভাবিয়া থাকেন যে, প্রচলিত বিধিবদ্ধ আইনের অপব্যবহার করিলেই বুঝি স্বদেশ-প্রেম দেখান হইল এবং এই ধারণার বশবর্ত্তী হইলেই আইন অমান্য করিয়া শৃঙ্খলা নাশ করিবার ক্ষমতা অতি সহজেই লাভ করা যায়। এই সকল

লোকের ভার করিয়া ইতিহাস পাঠ করা উচিত এবং তাহা হইলেই তাহারা তাহাদের চোখের সম্মুখে স্পষ্ট দেখিবে এবং হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিবে যে,একবার উচ্ছৃঙ্খলতা ও বে-আইনী উপদ্রবের তাণ্ডব-লীলা আরম্ভ হইলে কেহ আর তাহা সহজে দমন করিতে পারে না। মহাত্মা গন্ধীও এখন এই ধ্রুব শাশ্বত সত্য উপলব্ধি করিয়া নিজমুখে স্বীকার করিতেছেন যে,সাধারণের ভিতর বর্ত্তমান রুদ্রভাবের জন্য তিনিই সম্পূর্ণরূপ দায়ী। তিনি এখন কি করিতেছেন—তাঁহার কথা আমি উদ্ধৃত করিতেছি—"গত দুই দিনে 'স্বরাজের' ছবি যেরূপ দেখিয়াছি, তাহা আমার নাসারন্ধ্রে পূতিগন্ধ বিস্তার করিতেছে' * * 'শান্তিভঙ্গকারীদের উপর পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য আমি আমার সহধর্ম্মীদিগকে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে অনুরোধ করিতেছি'—তাঁহারা কি মহাত্মার এই কথায় কর্ণপাত করিবেন? যদি করেন, তাহা হইলে তাঁহারা কি এই অদম্য অশুভ ব্যাপারটিকে প্রশান্ত করিতে চেষ্টা করিবেন? বোম্বাইয়ের জনসঙ্ঘ যে লোকের ক্ষতি ও ধ্বংসোদ্দেশে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল, এ কথা মহাত্মা গন্ধীও স্বীকার করিয়াছেন—তাহারা তাঁহারও কথায় কর্ণপাত করা আবশ্যক মনে করে নাই। অহিংসার বাণী ওষ্ঠে লইয়া আমরা আমাদের ভিন্নমতাবলম্বীদিগকে ভয়প্রদর্শন করিয়া আমাদের ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতেছি। জীবনের কঠোর ঘাত-প্রতিঘাত এবং বহুদর্শিতার ফলে অনেকেই সম্ভবতঃ অবগত আছেন যে, 'অহিংস-অসহযোগ' কথাটি কেবল একটি অর্থহীন ভাষার আবৃত্তি মাত্র। এতদিনে যে মহামতি গন্ধী সেটা উপলব্ধি করিলেন, তজ্জন্য আমি ধন্যবাদ দিতেছি।

ঘৃণার স্থলে প্রীতি ও শক্রতার পরিবর্ত্তে মিত্রতার উপরেই যে এ দেশের মুক্তি সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে, এ সত্যও যে মহাত্মা হৃদয়ে উপলব্ধি করিবেন, এমত আশা করিতে পারি। আমরা সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের নিকট তাহার জন্য আন্তরিক প্রার্থনা করা ব্যতীত এ সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারি না। ইত্যবসরে

বাঙ্গালার শাসন বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারিস্বরূপে আমি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মহোদয়গণকে এবং আরও যাঁহারা তাঁহাদের বঙ্গমাতাকে অদূরে দৃশ্যমান জ্ঞান-গরিমা-মণ্ডিত উন্নতির পথে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের সকলকে সানুনয়ে বলি যে, তাঁহারা তাঁহাদের বর্ত্তমান বিপদের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহত হইয়া বিধিবদ্ধ আইনের ও শৃঙ্খলার পথ অবলম্বন করুন, যাহাতে তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা-লাভের সঙ্গে ব্যষ্টির পক্ষেও শান্তিলাভ ঘটিবে। তাঁহারা যেন সরকারকে অরাজকতা উচ্ছৃঙ্খলতা দমনে সাহায্য করেন। আর এখন কেহই সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে থাকিলে চলিবে না। হয় সরকারপক্ষ, নয় ত অপর পক্ষ অবলম্বন করিতে হইবে। যাঁহারা আইন শান্তির পক্ষে নহেন, তাঁহারা অশান্তি ও বিপ্লবের দিকে এবং বিপ্লব অর্থেই অরাজকতা।

উপদ্রব অশান্তি দমনের জন্য এবং শান্তশিষ্ট নিরীহ প্রজাদিগের আপনাপন ব্যবসা ও কারকারবার শান্তির সহিত চালাইবার জন্য বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের আয়ত্তাধীনে যত কিছু ক্ষমতা বা উপায় আছে সরকার তাহা প্রয়োগ করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করিবেন না, এবং ইহার জন্য নিজায়ত্তের বহির্ভূত ক্ষমতার প্রয়োজন হইলেও তাহা চাহিয়া লইতে সঙ্কুচিত হইবেন না। আইনপালক শিষ্ট সাধারণ জনমণ্ডলীর আন্তরিক চেষ্টা ও সহানুভূতি থাকিলে নিশ্চয়ই অচিরে শান্তি ও উন্নতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইবে এবং আপনারা সর্ব্বসাধারণের বিশ্বস্ত ও তাঁহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি বলিয়া আপনাদেরই এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে আমি অনুরোধ করি। যাহাতে শীঘ্রই উপদ্রব অত্যাচারের স্রোত প্রতিরুদ্ধ করিয়া মাতৃভূমিকে বিপদের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারেন, সে বিষয়ে যত্নবান্ হউন। আমি জানি, আমার এ অনুরোধ কখনই বৃথা হবে না।

গভর্ণরের বক্তৃতার পর

সার আশুতোষ চৌধুরী প্রস্তাব করেন, "গত ১৭ই

নবেম্বরে কলিকাতা সহরের কাজকর্ম্মের উপর যেরূপ ভাবে হস্তার্পণ করা হইয়াছিল, সেরূপ যাহাতে পুনরায় না ঘটে, তজ্জন্য কিরূপ উপায় অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক, তাহার আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন এবং সভার অন্যান্য কাজ বন্ধ রাখিয়া সেই বিষয় বিবেচিত হউক। মৌলবী একরাম উলহক বলেন, একদিনের জন্য সে আলোচনা বন্ধ রাখা হউক। কিন্তু ডেপুটী চেয়ারম্যান শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ রায় বলেন, বিষয়টি যেরূপ গুরুতর, তাহাতে ইহার আলোচনা বন্ধ রাখা কর্ত্তব্য নহে। অতঃপর মিঃ ওয়াটসন স্মাইথ, মিঃ হার্ব্বার্ট ষ্টাক, ডাক্তার সুরাওয়ার্দ্দী প্রভৃতি প্রস্তাবের পক্ষ-সমর্থন করেন। মিঃ রেজা রহমন খাঁ বলেন যে, যাহাতে বর্ত্তমান অবস্থার অন্যথা ঘটে, তাহা করা হউক, কিন্তু যেন দমন-নীতি প্রয়োগ করা না হয়। মিঃ সুরওয়ার্দ্দী বলেন যে, পুলিশ সাধারণ জনগণকে উত্তেজিত করিবার প্রয়াস পাইলেও লোক শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছিল। ইহাতে সার হেনরী হুইলার তাঁহাকে থামিতে বলেন। অতঃপর মিঃ সুরাওয়ার্দ্দী খেলাফৎ আন্দোলনের কথা উত্থাপন করিলে, ডেপুটী সভাপতি বলেন, ও কথার অবতারণার এ স্থান নহে। তাহার পর তিনি কনষ্টাণ্টিনোপলের ও খলিফার কথা তুলিলে পুনরায় তাঁহাকে সে কথার আলোচনা করিতে নিষেধ করা হয়। সুতরাং তিনি আর কিছুই বলেন নাই। শ্রীযুক্ত রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর বলেন, বর্ত্তমানে যে আইন আছে, তাহাই শান্তিরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট; নূতন কোন বিধি-ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই। মৌলবী কাশেম আলী বলেন, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা যে একান্ত আবশ্যক, সে বিষয়ে দ্বিমত নাই। সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় বলেন, শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হউক, কিন্তু ভয় এই যে, পুলিশকে এ বিষয়ে ভার দিলে অনেক পুলিশ-কর্ম্মচারী বাহাদুরী দেখাইতে গিয়া অত্যাচার করিবেন। অবশেষে সার হেনরী হুইলার সকল সদস্যের উক্তির প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া বলেন যে, সরকার দেশের বর্ত্তমান উপদ্রব ও অত্যাচার নিবারণে যেমন ঔদাসীন্য

অবলম্বন করিবেন না, তেমনই নিরপরাধ শান্তশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপর যাহাতে অত্যাচার না হয়, তাহাও দেখিবেন। ইহাতে সার আশুতোষ চৌধুরী তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহৃত করেন এবং বলেন, যদিও তিনি প্রস্তাব প্রত্যাহৃত করিলেন, কিন্তু ইহা সভায় উপস্থাপিত করার জন্য তিনি অণুমাত্র দুঃখিত নহেন।

বঙ্গীয় সরকারের ঘোষণা

(স্বেচ্ছাসেবকদল বে-আইনী)

ব্যবস্থাপক সভায় এই কথা হইয়া গেলে পর শুক্রবার সায়ংকালে বঙ্গীয় সরকার এক কমিউনিক প্রচার করিলেন। তাহাতে লিখিত হইল :—

"সকৌন্সিল গভর্ণরের অভিমত এই যে, বঙ্গীয় অসহযোগী স্বেচ্ছাসেবকদল, সেন্‌ট্রাল মহম্মদীয় স্বেচ্ছাসেবকদল এবং বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটীর স্বেচ্ছাসেবকদল এবং অন্য ঐ শ্রেণীর কতকগুলি সভা, যাহা এক্ষণে বঙ্গদেশে বিদ্যমান আছে, তাহাদিগের সকলেরই এক উদ্দেশ্য; ইহারা আইনমত কার্য্য পরিচালনে এবং শান্তিরক্ষা ও আইনপ্রতিপালন বিষয়ে হস্তার্পণ করিতেছে। এই হেতু ১৯০৮ সালের সংশোধিত ভারতবর্ষীয় ফৌজদারী আইন, যাহা ১৯২০ সালের ডিভলিউসান আইন দ্বারা সংশোধিত হইয়াছে, সেই আইন অনুসারে সকৌন্সিল গভর্ণর বাহাদুর ঘোষণা করিতেছেন যে, এই সকল সভা বে-আইনী।"

সভাবন্ধের আইন ঘোষণা

ইহার পরই কলিকাতার পুলিশ-কমিশনার এক ইস্তাহারে তাঁহার বিনা অনুমতিতে সহরের হদ্দার মধ্যে যে কোনও স্থানে সাধারণ সভা মাত্রকেই বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করেন।

ভারত-সরকারের মনোভাব

২৫শে নভেম্বর শুক্রবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদে বাঙ্গালার গবর্ণরের পূর্ব্বোক্ত বক্তৃতার পর ২৬শে নবেম্বর প্রাতে পঞ্জাব য়ুরোপীয়ান

বণিক্-সমিতির ২০ জন সভ্য দিল্লীতে বড়লাটের নিকট উপস্থিত হইয়া দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদিগের অভিমত ব্যক্ত করিলেন। তদুত্তরে লর্ড রেডিং বলেন :—

"সরকারের বর্ত্তমান ভাব দেখিয়া কাহারও কাহারও ভ্রান্ত ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। সরকার নিজের শক্তি ও ক্ষমতার বিষয় সম্যক্ অবগত আছেন এবং তাঁহার বিশ্বাস আছে, দেশের নিয়ম ও শৃঙ্খলার অনুরাগী বহু ব্যক্তি তাঁহাদিগের কার্য্যের সমর্থন করিয়া থাকেন। অবশ্য, সরকার তাঁহাদিগের শক্তির অপব্যবহার করেন নাই। এ জন্য অনেকে তাঁহাদিগের অনুসৃত নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া থাকেন। যাহাতে লোকের মনে বিরুদ্ধ ভাব উপস্থিত না হয় এবং তাঁহাদিগের কার্য্যের বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা না করে, এজন্য তাঁহারা সযত্নে অনেক কার্য্যে প্রতিনিবৃত্ত থাকিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে যে অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সরকারের পূর্ণ শক্তি প্রকট করা অবশ্যকর্ত্তব্য বিবেচিত হইয়াছে। নিয়ম ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সরকারকে শক্তি প্রদর্শন করিতেই হইবে। কোথাও কোথাও বিশেষ ভাবে লোককে ভয় প্রদর্শন ও তাহাদিগের উপর অন্যায়রূপ পীড়াপীড়ি করা হইতেছে। এই সকল ব্যবহার অত্যাচারের নামান্তর ; সুতরাং বিধি-বিগর্হিত কার্য্য। সরকার এরূপ ব্যবহারের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারেন না এবং তাহা নিবারণ করিতে বাধ্য। শান্তিপ্রিয় দেশবাসীদিগকে রক্ষার জন্য ও যাহাতে তাহারা আপন আপন কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিতে পারে, সে কার্য্যে সরকার তাঁহাদিগের সহায়তা করিবেন। কিন্তু অনিষ্টকারীদিগকে আইনের আমলে আনিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। ন্যায়সঙ্গত রাজনৈতিক আলোচনা সম্বন্ধে হস্তার্পণ করিতে সরকারের আদৌ ইচ্ছা নাই। সেই সকল রাজনৈতিক আলোচনা সরকারের বিরোধী হইলেও তাঁহারা তাহাতে আপত্তি করিবেন না। ন্যায়সঙ্গত অভাব অভিযোগ দূরীকরণেও তাঁহারা সমুৎসুক। কিন্তু যে রাজনৈতিক আন্দোলন দ্বারা

লোককে অত্যাচারপূর্ব্বক জবরদস্তী করা হয়, ভয়প্রদর্শন, অন্যায় পীড়াপীড়ি করা হয় ও আইন উল্লঙ্ঘন করা হয়, সরকার তাহা নিবারণে বদ্ধ-পরিকর থাকিবেন।" উপসংহারে বড়লাট বলেন, বর্ত্তমান সময়ে আরও অনেক রাজনৈতিক প্রশ্ন তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে, কিন্তু উপস্থিত তিনি ঐ কথাগুলি বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন।

বড়লাটের অনুমোদন

পরে ডিসেম্বর মাসে যখন বড়লাট লর্ড রেডিং কলিকাতায় আসেন, তখন তিনি বাঙ্গালার গবর্ণর লর্ড রোণাল্ডসের এই নীতি পূর্ণ সমর্থন করেন। মিউনিসিপ্যাল অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে নানা কথা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ইতঃপূর্ব্বে বাঙ্গালার ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশনে লর্ড রোণাল্ডসে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার অধিক আর তিনি কিছু বলিতে চাহেন না। তবে তিনি শাসন-ভার গ্রহণ করিয়া অবধি লর্ড রোণাল্ডসের কার্য্য যেরূপ সমর্থন করিয়াছেন, বর্ত্তমান অবস্থায়ও সেইরূপ সমর্থন করিবেন। তিনি আশা করেন, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিবেন, ভারত গভর্ণমেণ্ট তাহাতে তাঁহাকে সাহায্য করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিবেন না, এ কথা তিনি স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করেন এবং ইতঃপূর্ব্বে দিল্লীতে এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও সকলকে স্মরণ করাইয়া দেন।

বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটী

এ দিকে ২৫শে ও ২৬শে নবেম্বরের সরকারের এই কার্য্যানুষ্ঠানের পর ২৭শে নবেম্বর রবিবার ১১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর একটি সাধারণ অধিবেশন হইল। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইল :—

১। সমিতির বিশ্বাস, গভর্ণমেণ্ট কমিউনিকে ও অন্যান্য বিবরণে প্রকাশিত হইয়াছে যে, স্বেচ্ছাসেবকগণ ও কংগ্রেস-কর্ম্মীরা সাধারণকে ও

গভর্ণমেণ্টের কোন কোন শ্রেণীর কর্ম্মচারীদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়া দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে বিষম বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছেন,—উহা একেবারে নির্জ্জলা মিথ্যা। কমিটী প্রকাশ করিতেছেন, স্বেচ্ছাসেবকগণ বরাবর শান্ত ও নিরুপদ্রব ছিলেন; সুতরাং কমিটীর অভিমত—কংগ্রেসের কাজ পূর্ব্বেরই মত চালাইতে হইবে।

২। কমিটীর বিশ্বাস, পুলিশ-কমিশনার ও সপারিষদ গভর্ণর যে আদেশ প্রচার করিয়াছেন, তাহা ন্যায়বিগর্হিত ও স্বেচ্ছাচারপ্রসূত। উহার উদ্দেশ্য—বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির কার্য্যগুলি পণ্ড করা ও তৎসঙ্গে অসহযোগ আন্দোলন নষ্ট করা। সুতরাং এই সমিতি সর্ব্বসাধারণকে কংগ্রেসকর্ম্মী ও স্বেচ্ছাসেবক-শ্রেণীভুক্ত হইয়া শান্তভাবে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন।

৩। এই কমিটীর বিশ্বাস, কলিকাতায় ও মফঃস্বলে সাধারণ সভাসমিতি ও শোভাযাত্রা বন্ধ করিবার জন্য যে আদেশ-বাণী প্রচারিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বথা অন্যায় ও অবৈধ। কিন্তু কোন প্রকার সভাসমিতির অধিবেশন হইলে কংগ্রেসদ্রোহীদিগের প্রচেষ্টায় নানাপ্রকার অনিষ্টের সংঘটন হওয়া সম্ভব। তাই সমিতি স্থির করিয়াছেন, যে পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণ শান্তভাবে কার্য্য করিবার জন্য প্রস্তুত না হইবে, সে পর্য্যন্ত কোন সভা-সমিতির অধিবেশন এক প্রকার হইবে না।

৪। বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা বড়ই সঙ্গীন হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় অতঃপর সমিতির পক্ষ হইতে বঙ্গীয় খেলাফৎ কমিটীর সহিত পরামর্শ করিয়া কংগ্রেস-সংক্রান্ত সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবেন, ইহা সভায় স্থির হইল।

বঙ্গীয় খেলাফৎ-কমিটী

২৮শে নবেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক খেলাফৎ-কমিটীর এক অধিবেশন হইল। তাহাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইল:—

(১) পূর্ব্বের মতই শান্ত ও অত্যাচার-বর্জ্জিত ভাবে খেলাফৎ-কমিটীর কার্য্য চালান হউক ; সরকার যে চণ্ডনীতি চালাইতেছেন, তাহার জন্য যেন শৈথিল্য প্রকাশ না পায়।

(২) বঙ্গীয় সরকার ও কলিকাতার পুলিশ-কমিশনার খেলাফৎ কার্য্য ও দেশ-সেবায় নিযুক্ত অন্যান্য কমিটীর অসহযোগ আন্দোলন বে-আইনী ভাবে ধ্বংস করিবার জন্য যে সব আদেশ দিয়াছেন, তাহা অন্যায় ও যথেচ্ছাচারমূলক। খেলাফৎ-কমিটী জনসাধারণকে জানাইতেছেন যে, তাঁহারা যেন শান্ত ও অত্যাচারবর্জ্জিতভাবে তাঁহাদের দেশ ও ধর্ম্মের জন্য কার্য্য করিতে থাকেন, উল্লিখিত কমিটীগুলির অধীনে স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত করেন ও পূর্ব্বের মত কাজ করিতে থাকেন।

(৩) গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান ব্যবস্থায় দেশে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার জন্য খেলাফৎ-কমিটী বিবেচনা করিতেছেন যে, এই কমিটীর ভাইস-প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের উপর কমিটীর সকল ক্ষমতা অর্পণ করা বাঞ্ছনীয়। অন্য কোন নূতন নির্দ্ধারণ না করা পর্য্যন্ত তিনি ক্ষমতার ব্যবহার করিবেন। নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি যে কার্য্য-পদ্ধতি স্থির করিবেন, তাহাই বঙ্গীয় খেলাফৎ-কমিটীর সিদ্ধান্ত-সম্মত বলিয়া গৃহীত হইবে।

১। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ২। মৌলানা আবদুল রউফ, ৩। মৌলানা মহম্মদ আকরাম খাঁ, ও ৪। মৌলবী মুজিবর রহমান।

(৪) এই খেলাফৎ কমিটী এইরূপ মত প্রকাশ করিতেছেন যে, কলিকাতা ও মফস্বলে সাধারণ সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া যে সব আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা অন্যায় ও অহেতুক, যেহেতু, সভা ও শোভাযাত্রা ইতিপূর্ব্বে শান্তভাবেই করা হইয়াছে। কিন্তু খেলাফতের প্রতিকূল লোকজন কর্ত্তৃক যখন উত্তেজনার আশঙ্কা আছে, তখন এবং সেরূপ উত্তেজনা জনসাধারণের সকল সম্প্রদায় যতদূর সম্ভব সহ্য করিতে যত দিন না অভ্যস্ত হইতেছে, তত দিন কোন সভাসমিতি বসিতেছে না। সেই

জন্য খেলাফৎ-কমিটী স্থির করিতেছেন যে, ঐরূপ আদেশ যে যে স্থানে দেওয়া হইয়াছে, সেখানে সভা ও শোভাযাত্রা আপাততঃ বন্ধ রাখা হউক। যে পর্য্যন্ত না এই কমিটী অথবা এই কমিটী কর্ত্তৃক নিযুক্ত অপর কোন সমিতি এইরূপ মতপ্রকাশ করেন যে, দেশের লোক এখন সম্পূর্ণ শান্ত হইয়াছে এবং সম্পূর্ণভাবে অত্যাচার-বর্জ্জনের পক্ষপাতী হইয়াছে, সেই পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা বাহাল থাকিবে।

দেশবন্ধু ডিক্‌টেটর

এইরূপে নানা ঘটনার পর সমগ্র বঙ্গদেশের প্রধান হিন্দু মুসলমান রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে দেশের এই সঙ্কটসঙ্কুল সময়ে দেশের রাজনৈতিক কার্য্যনির্ব্বাহের একমাত্র পরিচালক বলিয়া স্বীকার করিলেন। দেশবাসীর বিশ্বাস ও আশাভরসার গৌরব-মুকুট ইতঃপূর্ব্বে আর কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। প্রাচীন রোমের বীরত্ব-গৌরবের দিনে সিনসিনেটাস ও কোরায়োলেনাস দেশবাসীর নিকট এমনই ভাবের সম্মান পাইয়াছিলেন, ইতিহাসে ইহা জানিতে পারি।

দেশবন্ধু ডিকটেটার পদে সমাসীন হইবার পর দেশবাসীকে সম্বোধন করিয়া উপর্য্যুপরি কয়েকটি আহ্বান-বাণী ঘোষণা করেন। তাহারই মধ্যে প্রথমটির কতকাংশ এইস্থানে উদ্ধৃত করিতেছি।

ডিক্‌টেটরের বাণী

বর্ত্তমানে বাঙ্গালা-সরকারের ইস্তাহার, পুলিশ-কমিশনারের আদেশ এবং বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেটগণ কর্ত্তৃক ১৪৪ ধারামতে নোটিশ জারী প্রভৃতি দ্বারা নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, অসহযোগ আন্দোলনকে ধ্বংস করিবার জন্য ব্যুরোক্রেশী বদ্ধপরিকর হইয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালার জনগণও এই স্বাধীনতার যুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছে। আমি দেশবাসীর প্রতি আশা ও উৎসাহের বার্ত্তা

প্রচার করিতেছি। আমি প্রথম হইতেই জানি, ব্যুরোক্রেশীই প্রথমে আইন ভঙ্গ আরম্ভ করিবে। ১৪৪ ধারামতে নানাস্থানে ইস্তাহার জারী করিয়া প্রথমেই এই আইন ভঙ্গ আরম্ভ হয় এবং এই আন্দোলনকে ধ্বংস করিবাব জন্য অনবরত এই আইন প্রয়োগ করিতে থাকে। কিন্তু এখন যখন দেখিতেছি যে, আমাদের আন্দোলন প্রায় সফলতা-মণ্ডিত হইতে চলিয়াছে, এখন ব্যুরোক্রেশী কেবল দিক্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেছেন না, পরন্তু বিস্মৃত আইন এবং পরিত্যক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়া আন্দোলনকে দমন করিবার জন্য যথাবিধি চেষ্টা করিতেছেন।

এ স্থলে আমাদের কর্ত্তব্য কি, তাহা দেশবাসীমাত্রেই জ্ঞাত আছেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস স্পষ্টরূপে ঘোষণা করিয়াছে যে, স্বরাজই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্যসাধনে সহযোগিতা-বর্জ্জনই একমাত্র উৎকৃষ্ট প্রণালী। ব্যুরোক্রেশী যাহাই করুন না কেন, বাঙ্গালার জাতীয় দল কখনই তাহাদের আদর্শ ভুলিতে পারে না। বঙ্গবাসীর আজ এক মহা পরীক্ষা উপস্থিত। এই সংগ্রামে জয়-পরাজয় সম্পূর্ণ তাহাদের উপর নির্ভর করিতেছে। দেশবাসীর প্রতি আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—তাঁহারা ধৈর্য্য ধরুন, প্রফুল্ল-ভাবে সমস্ত দুঃখকষ্ট সহ্য করুন, এবং নিখিল ভারত জাতীয় মহাসমিতি তাঁহাদিগের হস্তে যে মহান্ কার্য্য ন্যস্ত করিয়াছেন, প্রাণান্তেও তাঁহারা যেন সে কার্য্য পরিত্যাগ না করেন।

কংগ্রেসের কার্য্য কেবল স্বেচ্ছাসেবকের সাহায্যেই সম্পন্ন হইতে পারে। সকলেই এ কথাটি পরিষ্কাররূপে বুঝুন।

কংগ্রেস-কর্ম্মীর প্রতি

তোমাদের কাছে আমার প্রথম ও শেষ কথা এই যে, তোমরা কখনও অহিংস অসহযোগের আদর্শ পরিত্যাগ করিও না। আমি জানি, এই নীতির অনুসরণ করা বড়ই কষ্টকর। আমি জানি, কখন কখন উত্তেজনা

এতই প্রবল হয় যে, চিন্তায়, বাক্যে এবং কার্য্যে অহিংসভাব রক্ষা করা বড়ই কষ্টকর। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কংগ্রেসের প্রত্যেক কর্ম্মীকেই এই মহানীতির অনুসরণ করিতে হইবে, কারণ, সমগ্র আন্দোলনের কৃতকার্য্যতা একমাত্র ইহারই উপর নির্ভর করে। আমরা অনেক সময় অপরের স্কন্ধে দোষ চাপাইতে বড়ই পটু। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, সহরে যদি কোন হাঙ্গামা হয়, তবে আমরা গুণ্ডাদিগের উপর দোষারোপ করিয়া থাকি; কিন্তু আমরা যেন ভুলিয়া না যাই, এই তথাকথিত গুণ্ডাগণ আমাদেরই দেশবাসী। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, আমরা অসহযোগিগণই দেশরক্ষার দাবী করিতেছি। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, যতটা পরিমাণে আমরা জনসাধারণকে (তাহারা গুণ্ডা হউক কি নাই হউক) সংযত রাখিয়া শান্তিরক্ষা করিতে বিফল হইব, ততটা পরিমাণে আমাদের অসহযোগ আন্দোলন অকৃতকার্য্য হইবে। দায়িত্ব আমাদেরই; আমাদের মুখে এ কথা বলা সাজে না যে, দুষ্ট লোকেরা জনসাধারণকে শান্তি ও আইনভঙ্গ করিতে উত্তেজিত করিয়াছে। তোমরা কি বুঝ না যে, আমাদের আন্দোলনের কৃতকার্য্যতা একমাত্র এই একটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে যে, দুষ্টই হউক কি অদুষ্টই হউক, কোন লোকেই যেন আমাদের দেশের জনসাধারণকে অথবা দেশের সম্প্রদায়-বিশেষকে অনাচার ও অত্যাচার করিতে প্রলুব্ধ করিতে না পারে। আমরা যদি জনসাধারণকে সংযত রাখিতে না পারি, তবে আমরা কি করিয়া সফলতা-লাভের দাবী করিব? আমি নিজে নিরাশ হই নাই, আমি তোমাদিগকেও নিরাশ হইতে বলি না। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাদিগকে সম্পূর্ণ অত্যাচারবিহীন হইয়া শান্তভাবে এই মহাসংগ্রাম চালাইবার শক্তি প্রদান করেন।

ওয়ার্কিং কমিটীর আদেশ

দেশবন্ধু তাঁহার প্রত্যেক বাণীতে 'কংগ্রেসের আদেশের' কথা উল্লেখ

করিয়াছেন। এই কংগ্রেসের আদেশ কি, তাহা না জানিলে তাহার এই উল্লেখের মর্ম্ম গ্রহণ করা যায় না। বাঙ্গালা-সরকার যে ২৫শে নবেম্বর তারিখে কংগ্রেস ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবক বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করেন, উহার পূর্ব্বে ২২শে ও ২৩শে নবেম্বর-বোম্বাই সহরে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশন হইয়াছিল, প্রথমে সুরাটে অধিবেশনের কথা ছিল। কিন্তু বোম্বাইয়ের হাঙ্গামা হেতু মহাত্মা গন্ধী বোম্বাই ত্যাগ করিতে না পারায় বোম্বাই সহরেই অধিবেশন হয়।

২২শে ও ২৩শে তারিখে কমিটীর কার্য্য চলে। মহাত্মা গন্ধী (সভাপতি) লালা লজপৎ রায়, শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ভি, জে, প্যাটেল, এন, সি, কেলকার, হাকিম আজমল খাঁ, শেঠ উমার সোভানি, কালাম আজাদ, শেঠ যমুনালাল বাজাজ, ডাঃ আনসারী, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, সি, রাজগোপাল আচারিয়া প্রভৃতি নেতৃগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। গত নাগপুর কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত বিজয়রাঘব আচারিয়া যোগ দেন নাই।

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় ;—

কমিটী বিবেচনা করেন যে, অসহযোগীদের সমুদয় স্বেচ্ছাসেবক সঙ্ঘ, খেলাফৎ স্বেচ্ছাসেবক সঙ্ঘ এবং অন্যান্য বে-সরকারী স্বেচ্ছাসেবক দলগুলিকে আমাদের আয়ত্তাধীন করা জাতীয় কার্য্যের জন্য অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সকল স্বেচ্ছাসেবক দলের নাম হইবে—ন্যাশন্যাল ভলান্টিয়ার কোর বা জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক সঙ্ঘ। ওয়ার্কিং কমিটী সেই জন্য প্রত্যেক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীকে বলিতেছেন যে, তাঁহারা যেন স্ব স্ব প্রদেশে সেনট্রাল বোর্ড গঠন করিয়া তথাকার সমুদয় স্বেচ্ছাসেবক-দলগুলিকে আয়ত্তাধীন ও নিম্নপ্রকার নিয়মের অধীন করেন।

প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীগুলির জন্য ওয়ার্কিং কমিটী নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। সেনট্রাল খেলাফৎ-কমিটী, খালসা কমিটী ও অন্যান্য এইরূপ কমিটীগুলিকেও ওয়ার্কিং কমিটী অনুরোধ করিয়াছেন,

যদি তাঁহারা এই ব্যবস্থায় সম্মত থাকেন,তাহা হইলে সেই অনুসারে কার্য্য করিবেন।

চিত্তরঞ্জন ওয়ার্কিং কমিটীর আদেশ অনুসারে বাঙ্গালার কংগ্রেস ও খেলাফতের ডিক্‌টেটর-রূপে পূর্ব্বোক্ত ঘোষণা-বাণী প্রচার করেন। উহার পর তাঁহার আরও কয়েকটি ঐ ভাবের ঘোষণা প্রচার হয়। বাঙ্গালা-সরকারও নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। তাঁহারা চিত্তরঞ্জনের ভলাণ্টিয়ার আহ্বানের এবং নিজের ভলাণ্টিয়ার হইবার ঘোষণা বে-আইনী বলিয়া স্থির করিলেন। তাঁহাদের মনের ভাব নিম্নলিখিত ইস্তাহারেই প্রকাশ পায়:—

সরকারী কমিউনিক

১৯শে নবেম্বর সংবাদপত্রে যে ঘোষণা বাহির হইয়াছে, উহাতে সরকার-পক্ষ হইতে দেখান হইয়াছে যে, কংগ্রেস ও খেলাফৎ ভলাণ্টিয়াররা লোককে ক্রমাগত ভীতি-প্রদর্শন করিতেছে ও বিরক্ত করিতেছে। ইহাতে সরকার ১৯০৮ সালের ফৌজদারী সংশোধিত আইনের ১৬ ধারা অনুসারে এক নোটিশ জারী করেন। ঐ নোটিশে কতকগুলি সমিতি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয়। ইহার আশু ফল শুভ হইয়াছিল। প্রকাশ্যে পিকেটিং ও ভয়প্রদর্শন কিছু কালের জন্য বন্ধ হইয়াছিল।

২২শে নবেম্বর তারিখে চরমপন্থী সংবাদপত্র-সমূহ একটি উক্তি প্রকাশ করে। উহাতে অনেকগুলি নাম স্বাক্ষর ছিল এবং পর পর কয় দিন অনেক নূতন নাম সংযুক্ত হইয়াছিল। উহাতে সরকারের এই আইন-জারিকে সরাসরি অমান্য করা হইয়াছিল। উক্তিটি এই:—

"এই হেতু আমাদের মতে এই সকল স্বেচ্ছাসেবক সমিতির অবস্থিতি ও কার্য্য নির্ব্বাহ করা একান্ত কর্ত্তব্য, কারণ,গভর্ণরের এই আদেশ স্বেচ্ছা-তন্ত্রমূলক ও অন্যায়। আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীরা এই মতের সমর্থক, ইহা দেখাইবার জন্য ব্যক্তিগতভাবে বাঙ্গালার এই জাতীয় স্বেচ্ছাসেবকদলে

নাম দিতেছি এবং যাবতীয় প্রাদেশিক ও জেলা কংগ্রেস কমিটীর সভ্যগণকে এই সমিতিতে অথবা ইহার অনুরূপ যে কোনও সমিতিতে নাম দিতে অনুরোধ করিতেছি।"

আইনে অবজ্ঞা

স্বাক্ষরকারীদিগের এই কার্য্যে যে সরাসরি আইনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হইয়াছে,ইহা বুঝাইবার জন্য ২৪শে নবেম্বর তারিখে বাঙ্গালার জাতীয় স্বেচ্ছাসেবকদলকে বে-আইনী বলিয়া সরকারপক্ষ হইতে ঘোষণা করা হয়।

২২শে নবেম্বর ছয় জন নেতার নাম স্বাক্ষর করিয়া "সার্ভ্যাণ্ট" পত্রে এই পত্রখানি প্রকাশিত হয়:—

"স্বেচ্ছাসেবক সমিতি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হওয়া সম্পর্কে আমরা বলিতে চাহি যে, উহা কংগ্রেসের আদেশের বিরুদ্ধ,এই হেতু উহা আমরা অমান্য করিয়াছি। আমরা স্বেচ্ছাসেবকরূপে নাম লিখাইয়াছি এবং সমস্ত কংগ্রেস সভ্যকে নাম লিখাইতে বলিয়াছি।"

২৭শে নবেম্বর তারিখে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর এক সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় এই মন্তব্য গৃহীত হইয়াছিল:—

"৪র্থ মন্তব্যে ধার্য্য হইল, বর্ত্তমান সঙ্কট-সঙ্কুল রাজনৈতিক অবস্থা বুঝিয়া আমরা বাঙ্গালা প্রদেশে এই কমিটীর প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশকে কংগ্রেস ও খেলাফৎ-কমিটীদ্বয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া কংগ্রেসের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিবার প্রভুত্বভার অর্পণ করিতেছি।"

ইহার পর খেলাফৎ-কমিটীও ইহার অনুরূপ মন্তব্য পাশ করেন। তবে তাঁহারা মিঃ দাশের সহিত পরামর্শ করিবার নিমিত্ত ৪ জন সভ্যকে লইয়া এক পরামর্শ-কমিটীর নিয়োগ করেন। এই মন্তব্য দুইটিও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

১০ লক্ষ ভলাণ্টিয়ার আহ্বান

২রা ডিসেম্বর মিঃ দাশ "আমার দেশবাসীদিগের প্রতি" শীর্ষক এক উক্তি প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি ১০ লক্ষ ভলাণ্টিয়ার আহ্বান করেন।

৫ই ডিসেম্বর চরমপন্থী সংবাদপত্রসমূহে মিঃ দাশ এক বিজ্ঞাপন দেন, উহাতে তিনি ভলাণ্টিয়ার আহ্বান করেন।

৬ই ডিসেম্বর চিত্তরঞ্জন দাশ কলিকাতার ছাত্রসমাজকে উদ্দেশ করিয়া এক নিবেদন করেন। উহা পরে মুদ্রিত পুস্তিকাকারে প্রচারিত হইয়াছে। উহাতে তিনি বলিয়াছেন, "এত বড় সহরে মাত্র ৫ হাজার যুবক কংগ্রেস ভলাণ্টিয়ার! এ দিকে এত ছাত্র থাকিতে লোকের অভাবে কি কংগ্রেসের কার্য্য বন্ধ হইবে? মায়ের ডাকে ছাত্ররা সাড়া দিতেছে না, ইহা কি লজ্জার কথা নহে?"

ভলাণ্টিয়ার প্রেরণ

ঐ দিন 'সার্ভ্যাণ্ট' পত্রে ছিল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আদেশে ভলাণ্টিয়াররা বড়বাজারের দিকে স্বদেশী কার্য্যে প্রেরিত হয়। প্রথম দলেই চিত্তরঞ্জনের পুত্র শ্রীমান্ চিররঞ্জন ছিল। সে কয়েকজন ভলাণ্টিয়ারের সহিত গ্রেপ্তার হয়। ইহার পর আরও কয়েকটি দল প্রেরিত হয়। উহাদের মধ্যে দুটি দল ছাড়া অন্য দল গ্রেপ্তার হয় নাই।

সরকারকে সমরে আহ্বান

নেতৃবর্গ সরকারের আইন অবজ্ঞা করিয়া এইরূপে সরকারকে সমরে আহ্বান করিয়াছেন। ৭ই ডিসেম্বর অন্যান্য পুরুষ ভলাণ্টিয়ারের সহিত মিঃ দাশের পত্নী, ভগিনী ও অন্য একটি মহিলা পুলিশকে গ্রেপ্তার করিবার সুযোগ দিতে ভলাণ্টিয়াররূপে বহির্গত হন। তাঁহাদের ৮ই ডিসেম্বরের বাণীতে আছে—"আমরা গ্রেপ্তার হইবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলাম।"

তাঁহাদিগকে এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাঁহারা যখন নিবৃত্ত হইলেন না, তখন পুলিশ অগত্যা তাঁহা-দিগকে গ্রেপ্তার করিতে বাধ্য হইল। তাঁহাদিগকে প্রেসিডেন্সী জেলে রাখা হয় ও পরে ঐ রাত্রেই সরকারের আদেশে মুক্তি দেওয়া হয়।

মহিলাদের বাণী

"আমরা সরকারী অনুষ্ঠানের ছাত্রদিগকে একযোগে কলেজ ছাড়িয়া দিয়া মুক্তি-সংগ্রামে যোগদান করিতে অনুরোধ করিতেছি। হয় এখন কার্য্যে যোগদান কর, না হয় আর এ সময় আসিবে না। ইহাই আমা-দের শেষ কথা। এই মহৎ যুদ্ধে হয় আমরা জয়ী হইব, না হয় মরিব। উভয়ই গৌরবের। হয় জীবন, না হয় মৃত্যু, এই দাসত্ব আর বাঞ্ছনীয় নহে। আমরা পুলিশ-কর্ম্মচারীদিগকে চাকুরী ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিতেছি। তাহারা বুঝিয়া দেখুক যে, এই নোঙরা কাজ করা অপেক্ষা অনাহারে মরা ভাল।"

ভলাণ্টিয়ার প্রেরণ

৯ই ও ১০ই ডিসেম্বরও নেতৃবর্গ ভলাণ্টিয়ার-প্রেরণনীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। পুলিশ যদিও সমস্ত ভলাণ্টিয়ারকে ধৃত করে নাই, তথাপি এই তিন দিনে ৫০০ ভলাণ্টিয়ার গ্রেপ্তার হইয়াছে। তাহাদের কার্য্যে সহরের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিষম পর্য্যুদস্ত হইয়াছে।

দাঙ্গার ভয়

প্রতিক্ষণে দাঙ্গা ও লুঠ হইবে বলিয়া এমন ভয় হইল যে, পুলিশ-কমি-শনার সহরের কোনও কোনও কেন্দ্রে সৈন্যসজ্জা করা আবশ্যক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। সম্প্রতি একস্থানে গুপ্ত অস্ত্র-শস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার আবিষ্কারে ইহাই অনুসূচিত হইতেছে যে, উহা দ্বারা অত্যাচার-অনাচার অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা। ইহা সরকার ও আইনভক্ত প্রজা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না।

আইন চালাইতে হইবে

এই সকল আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে, এই আন্দোলনের নেতৃবর্গ ইচ্ছাপূর্ব্বক সরকারের আইন ও শৃঙ্খলা-রক্ষার শক্তিকে সমরে আহ্বান করিয়াছেন। ইহার একমাত্র উত্তর আছে। এই সকল নেতা এতাবৎ স্বদেশপ্রীতির দোহাই দিয়া মহিলাগণকে এবং কোমলমতি যুবকগণকে উত্তেজিত করিয়া সরকারকে তাঁহাদের বিপক্ষে আইন চালাইতে বাধ্য করিয়াছেন। যদিও এই শ্রেণীর বহু অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা আবশ্যক হইয়াছে, তথাপি বিপক্ষে চালিত এই সকল অপরাধীর উপর তাহাদের পথিপ্রদর্শকদিগের অপরাধ অর্পণ করা সরকারের অভিপ্রেত নহে। সরকার পরামর্শ পাইয়াছেন যে, আইনের দৃষ্টিতে এই সকল নেতা অপরাধ করিয়া অভিযুক্ত হইবার অবকাশ প্রদান করিয়াছেন। এ অবস্থায় তাঁহাদের সম্পর্কেও আইন চালাইতে বাধ্য হওয়া ভিন্ন সরকারের অন্য উপায় নাই। এই হেতু যাঁহারা বর্ত্তমান অবস্থার জন্য দায়ী, তাঁহাদিগকে বিচারার্থ গ্রেপ্তার করা স্থির হইয়াছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দেশবন্ধু গ্রেপ্তার

ইহার পর আর কাহারও মনে সংশয় রহিল না যে, দেশবন্ধু গ্রেপ্তার হইবেন। তাহাই হইল।

১০ই ডিসেম্বর শনিবার অপরাহ্ণ সাড়ে ৪টার সময় চিত্তরঞ্জনও গ্রেপ্তার হইলেন। ঐ দিনই শ্রীমান্ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মৌলানা আকরাম খাঁ, পদ্মরাজ জৈন, মৌলবী আহম্মদ প্রভৃতি কর্ম্মীরাও গ্রেপ্তার হইলেন।

গ্রেপ্তারের বিবরণ

১০ই ডিসেম্বর শনিবার দ্বিপ্রহর হইতেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন গ্রেপ্তার হইবেন বলিয়া একটা প্রবল জনরব রটিয়াছিল। অপরাহ্ণে দেশবন্ধুর পুরনারীরা তাঁহাকে একরূপ বিদায়ই দিয়াছিলেন। ঐদিন তাঁহাদের ভবানীপুর কালীঘাট অঞ্চলে খদ্দর-প্রচারে যাইবার কথা ছিল। বেলা ৩টার সময়েই দেশবন্ধু সংবাদ পান, তাঁহাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিতে আসিতেছে। সে সংবাদ শুনিয়া তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই, পূর্ব্বাপর সমান অচল-অটল ছিলেন, বলেন, "আমি সে জন্য প্রস্তুত হইয়াই আছি।"

দেশবন্ধুর গৃহে পুলিশ

বেলা ৪৷৷০ টার সময় দুইখানা মোটরকারে পুলিশ দেশবন্ধুর আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। দেশবন্ধু তখন হাত-মুখ ধুইয়া চা খাইতে বসিয়াছেন। পুলিশের দলে ছিলেন ডেপুটী কমিশনার কিড, আর ছিল কয়েকজন গোরা সার্জ্জেণ্ট। তখন বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল দাশ মহাশয়ের বাড়ীতে ছিলেন। পুলিশ সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকেই গ্রেপ্তার করে।

এক পয়সার মুড়কীই যথেষ্ট

দেশবন্ধুর পুরমহিলাগণ জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহার খাবার কি বাড়ী হইতে হাজতে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে? দেশবন্ধু গম্ভীরস্বরে বলেন, "না, উহার প্রয়োজন নাই। **সাধারণ জেল-কয়েদীর খানাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে!** এক পয়সার মুড়কী হইলেও তাঁহার আপত্তি নাই।"

গ্রেপ্তার

এই কথা বলিয়া তিনি ধীর-গম্ভীরভাবে পুলিশকে বলেন, "এই আমি হাজির আছি। আমি কি গ্রেপ্তার হইলাম?" পুলিশ-কর্ত্তা বলেন, "আমি আপনাকে লালবাজারে লইয়া যাইতে আসিয়াছি।" দেশবন্ধু বলেন, "আপনারা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আনিয়াছেন?" উত্তর হয়, "বাঙ্গালা-সরকারের বিশেষ আদেশে আপনাকে গ্রেপ্তার করিতেছি।"

লালবাজারে যাত্রা

অতঃপর দেশবন্ধু ও শাসমল মহাশয়কে লালবাজারে লইয়া যাওয়া হয়। সেই যাত্রাকালে **পুরনারীরা শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি করিতে থাকেন।** পথে এই গ্রেপ্তারের কথা শুনিয়া বিস্তর লোক সমবেত হইয়াছিল, তাহারা সমস্বরে "মহাত্মা গন্ধীজীকি জয়" "দেশবন্ধুর জয়" বলিয়া উল্লাসধ্বনি করিতে থাকে।

প্রেসিডেন্সী জেল

লালবাজারে দেশবন্ধু ও শাসমল মহাশয়কে লইয়া যাওয়া হয়। ঐ স্থানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর পুলিশ তাঁহাদিগকে প্রেসিডেন্সী জেলে লইয়া যায়।

দেশবন্ধুর বিদায়-বাণী

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই বিদায়-বাণী দেশবাসীকে দিয়া যান :—"দেশবাসীর প্রতি আমার এই শেষ বাণী। জয় নিকটবর্ত্তী, যদি আপনারা সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকেন। এই দুঃখ-বিপদের মধ্যে দিয়া জাতির উদ্ভব হইয়া থাকে। এ দুঃখ-বিপদ্ আপনাদিগকে সাহস ও ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিতে হইবে। মনে রাখুন, যতদিন আপনারা অহিংসার পথ অবলম্বন করিয়া থাকিবেন, ততদিন আপনারা আমলাতন্ত্র-শাসনকে অন্যায়ের পথে রাখিতে পারিবেন। কিন্তু মহাত্মা গন্ধী প্রদর্শিত পথ হইতে কণামাত্র বিচলিত হইলে আপনাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। স্বরাজই আমাদের চরম লক্ষ্য।"

দেশবন্ধুর বিচার

২১শে পৌষ ৬ই জানুয়ারী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বিচার উপলক্ষে দ্বিপ্রহরে ও অপরাহ্নে কলিকাতা সহরে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। বিচার হইবার বহু পূর্ব্বেই চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল। বিচারের সময় উকীল, ব্যারিষ্টার ও সংবাদপত্রের প্রতিনিধি ছাড়া আর সকলকে আদালত হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। হাইকোর্টের প্রায় সমস্ত নবীন ও প্রবীণ ব্যারিষ্টার এবং উকীল দেশবন্ধুর মামলা দেখিতে গিয়াছিলেন। শ্রীযুত দাশ যখন আদালত-গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের জন্য সকলে দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিলেন। জল খাইবার ছুটীর পর যখন আদালত বসে, তখনও সকলে ঐ ভাবে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

আদালতে প্রবেশ করিয়া দেশবন্ধু কাঠগড়ার রেলিংয়ের উপর হাত নামাইয়া শান্তভাবে দাঁড়াইয়া বিচার দেখিয়াছিলেন। কয়েকদিনের কষ্ট

করায় তাঁহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার শুষ্ক দেহ ও তৈলহীন কেশ দেখিয়া তাঁহাকে তপস্বী বলিয়া মনে হইতেছিল। বন্ধুগণের সহিত কথা কহিবার সময় তিনি প্রাণ খুলিয়া হাসিয়াছিলেন।

জল খাবারের ছুটীর সময় বাহিরে উপস্থিত লোকজন খুব আনন্দোল্লাস প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখন পথে পূর্ব্বাপেক্ষা খুব বেশী ভিড় হইয়াছিল, বিচারের পর যখন জেলের গাড়ীতে করিয়া দেশবন্ধু শ্রীযুত শাসমল ও সুভাষ বসুকে প্রেসিডেন্সী জেলে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন সকলে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দ্বারা গগন-পবন মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই ভিড়ের মধ্যে অনেক ভদ্রবংশসম্ভূত লোক ছিলেন। এরূপ আন্দোলনের সময় লোকের মনে ছোট বড় বিচার করিবার জ্ঞান থাকে না। সব লোক অফিসের কাজের কথা ভুলিয়া গিয়া দেশবন্ধুর বিচারের ফলাফল জানিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পুলিশ-কনেষ্টবলগণও দলে ভিড়িয়া পড়িয়াছিল। বহুসংখ্যক কলেজের ছাত্র, মাড়োয়ারী ও মুসলমান, দেশনেতাগণের দর্শনলাভ করিবার জন্য আদালতের চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হইয়াছিলেন।

মিষ্টার ডি, সিল্ভা প্রভৃতি অনেক উকীলই, সরকারী উকীল রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধুকে অনুরোধ করিলেন যে, শ্রীযুত দাশকে একখানি চেয়ার দেওয়া হউক, তখন তারকবাবু সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। কিন্তু এক ঘণ্টা পরে রায় বাহাদুর আবার কি ভাবিয়া শ্রীযুক্ত দাশকে চেয়ার দিবার জন্য আদালতের অনুমতি চাহিয়াছিলেন।

মিঃ গুইণ্ডি ও অন্য একজন পুলিশ কর্ম্মচারী সরকারী উকীল রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধুকে পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিতেছিলেন। সরকারী উকীল ফৌজদারী সংস্কার আইনের ১৬ ধারা পাঠ করিলেন। ঐ ধারায় সকাউন্সিল বড়লাটকে সভা বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর যে ইস্তাহারে বঙ্গদেশে স্বেচ্ছাসেবক দলগুলিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহা পাঠ

করিলেন। তাহার পর ফৌজদারী আইনের ১৭ ধারা পাঠ করিয়া সাক্ষিগণের প্রমাণ দিয়া অভিযোগটি স্থির করিয়া দিলেন ;—

(১) শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশের স্বাক্ষরিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর একখানি নোটিশ,২রা ডিসেম্বর তারিখে 'সার্ভেন্ট' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' প্রকাশ হইয়াছিল। ১০ই ডিসেম্বর 'সার্ভেন্ট' ও 'পত্রিকা' কার্য্যালয় খানাতল্লাস করিয়া ঐ নোটিশের মূলখানি পাওয়া গিয়াছিল।

(২) শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ-স্বাক্ষরিত "দেশবাসিগণের প্রতি আবেদন" শীর্ষক একখানি নোটিশ ২রা তারিখের 'সার্ভেন্ট' ও 'পত্রিকায়' প্রকাশিত হইয়াছিল—তাহার মূলও খানাতল্লাসের পর পাওয়া গিয়াছিল।

(৩) শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ-স্বাক্ষরিত "কংগ্রেস ও ব্যুরোক্রেসী" শীর্ষক প্রবন্ধটি ৫ই ডিসেম্বর 'সার্ভেন্ট' ও ৭ই তারিখের 'পত্রিকায়' প্রকাশিত হইয়াছিল—খানাতল্লাসের সময় তাহার মূলও পাওয়া গিয়াছিল।

(৪) শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ-স্বাক্ষরিত "কলিকাতায় ছাত্রগণের প্রতি আবেদন" শীর্ষক প্রবন্ধটি ৭ই তারিখে 'সার্ভেন্টে' ও ১০ই তারিখে 'পত্রিকায়' প্রকাশিত হইয়াছিল। খানাতল্লাসের সময় তাহার মূলও পাওয়া গিয়াছিল।

সরকারী উকীল একে একে সাক্ষিগণকে ডাকিতে লাগিলেন—

প্রথম সাক্ষী—মুচীপাড়া থানার ইনস্পেক্টার এ. হামিদ। তিনি ১৮ই নবেম্বর তারিখের কয়েকটি নোটিশ পাইয়াছিলেন—তিনি "সার্ভেন্ট" আফিস চিনেন এবং ১০ই ডিসেম্বর উক্ত আফিসে খানাতল্লাস করিয়াছিলেন। তিনি ১০ই ডিসেম্বর "সার্ভেন্ট" পত্রগুলি লইয়া গিয়াছিলেন।

সাক্ষী পাঁচুগোপাল দত্ত মুচীপাড়া থানার সম্মুখে বৌবাজার ষ্ট্রীটে বাস করেন। 'সার্ভেন্ট' আফিস খানাতল্লাসের সময় তিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং সন্ধানী জিনিষের তালিকায় স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। তিনি সকল কাগজগুলির উপরও সহি করিয়াছিলেন।

সাক্ষী রমেন্দ্রনাথ ঘোষ 'সার্ভেন্ট' আফিসে প্রুফ রীডার ও

মুদ্রাকরের কার্য্য করেন। তিনি ২রা ডিসেম্বর তারিখের 'সার্ভেণ্ট' মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশের বাণী ছাপা হইয়াছিল।

ঐ প্রকারে ইনস্পেক্টার এন, পণ্ডিত, অনিলচন্দ্র দত্ত এবং মৃণালকান্তি ঘোষ সাক্ষ্য দেন যে, পত্রিকা আফিস খানাতল্লাসের সময় তাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং ঐ সকল নোটিশগুলি দেখিয়াছিলেন।

চেয়ার দিবার কথা

বেলা ১টার সময় সরকারী উকীলের প্রস্তাবের অনুসারে বিচারক শ্রীযুত দাশকে বলিলেন, "আপনি কি একখানি চেয়ার লইবেন?"

শ্রীযুত দাশ।—আমি চাই না, আপনাকে ধন্যবাদ, আমি এখানে বেশ আছি।

বিচারক।—একখানি চেয়ার দেওয়া হইল, দরকার হইলে আপনি বসিতে পারিবেন।

শ্রীযুত দাশ।—আমি চেয়ার চাই না, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিতেছি।

একখানি চেয়ার দেওয়া হইল, কিন্তু শ্রীযুত দাশ কোন সময়েই তাহার উপর বসেন নাই।

কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগের পুলিশের ডেপুটী কমিশনার মিষ্টার কিড বলিলেন—"গত ১০ই ডিসেম্বর মিঃ মেকেঞ্জিকে সঙ্গে লইয়া আমি দাশের বাটীতে গিয়াছিলাম। তখন বেলা সাড়ে ৫টা, দাশ মহাশয় তখন উপরতালায় বসিয়া চা পান করিতেছিলেন, আমরা উপরে যাইয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করি।"

আলিপুর পুলিশের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলেন—"আমি শ্রীযুত দাশকে চিনি এবং তাঁহার হাতের লেখা চিনি।" তাহার পর তাঁহাকে পূর্ব্বোল্লিখিত তিনখানি নিবেদনের মূল দেখান হইয়াছিল।

সরকারী উকিল তখন বলেন,—"আমি আমার কার্য্য শেষ করিয়াছি।"

তাহার পর ব্যারিষ্টার শ্রীযুত নিশীথচন্দ্র সেন বিচারকের অনুমতি লইয়া স্বাক্ষরগুলি দেখিতে চাহেন।

বিচারক বলেন—"এ মামলায় আপনার কিছু করিবার নাই—আমি বাহিরের কোন লোককে দলিল দেখিতে দিব না ;—আপনি কোন্ পক্ষের উকীল ? আপনি কি আসামীর পক্ষ-সমর্থন করিবেন ?"

শ্রীযুত সেন।—আমি আসামীর পক্ষের লোক নহি। উকীল হিসাবে আমি মামলাটি দেখিতেছি।

বিচারক।—আপনি কিছু বলিতে পারেন, কিন্তু দলিল দেখিতে পাইবেন না।

শ্রীযুত সেন।—স্বাক্ষর না দেখিয়া আমি কি বলিব ?

তাহার পর আদালতে জলখাবারের ছুটী হইল। ফিরিয়া আসিয়া সরকারী উকীল রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধু বলেন—"শেষ সাক্ষীর জবানবন্দীতে প্রমাণ হইয়াছে যে, ঐ স্বাক্ষরগুলি আসামীর স্বহস্তের। স্বাক্ষরগুলি শ্রীযুত দাশের কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য আমি এই নোটিশগুলি হস্তাক্ষর বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির নিকট পাঠাইতেছি—এইখানে আমার বক্তব্য শেষ করিলাম।"

বিচারক।—আপনি কয়দিন সময় চাহেন ?

সরকারী উকীল।—এক সপ্তাহ হইলেই হইবে।

বিচারক।—আচ্ছা—১২ই তারিখ আমি মামলার দিন ফেলিলাম।

বিচারক তখন শ্রীযুত দাশকে সম্বোধন করিয়া বলেন—"আপনি কি কিছু বলিতে চাহেন ?"

শ্রীযুত দাশ।—আমি কোন কার্য্যে যোগদান করিব না। আমার বলিবার কিছুই নাই।

বিচারক।—আমি জানিতে চাই, মামলা মুলতুবী রাখায় আপনার কোন আপত্তি আছে কি না ?

শ্রীযুত দাশ।—আমি কোন কার্য্যে যোগদান করিব না, আমার বলিবার কিছুই নাই।

তাহার পর ১২ই জানুয়ারী মামলার দিন ফেলা হইলে শ্রীযুত দাশকে কাঠগড়া হইতে লইয়া যাওয়া হয়।

আবার বিচারের দিন

উড়িয়া বালকের নির্ভীকতা

দেশবন্ধুর মামলা ইহার পর কয়দিন মুলতুবী হয়। পুলিশের সব সাক্ষ্য সংগৃহীত হয় নাই, ইহাই কারণ দেখান হইয়াছিল। পরে ২০শে জানুয়ারী তারিখে মামলার দিনে প্রেসিডেন্সী জেলের মধ্যে শুনানী শেষ হয়, ম্যাজিষ্ট্রেট ২৪শে জানুয়ারী রায় দিবেন বলিয়া প্রকাশ করেন। ইহার পূর্ব্বে ১২ই জানুয়ারী তারিখের মামলার শুনানীর দিন এক কাণ্ড বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তখনও বাংশাল ষ্ট্রীটে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে দেশবন্ধুর মামলার শুনানী হইতেছে। এই উপলক্ষে বাংশাল ষ্ট্রীট অঞ্চল ঐদিন লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। এদিন আর দাশ মহাশয়কে এজলাসমধ্যে লইয়া যাওয়া হয় নাই, তাঁহাকে আদালতের বারান্দায় রাখা হইয়াছিল। সেইখানেই তাঁহাকে জানান হয় যে, তাঁহার মামলা ২০শে পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

দাশ মহাশয়ের মামলার কায এইরূপে শেষ হইয়া যাইবার পরে তাঁহাকে আবার জেলে লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু আদালত বসিতে না বসিতেই যে মামলা এই ভাবে মুলতুবী রাখা হইবে এবং দাশ মহাশয়কে আবার জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে, জনতা সে অনুমান করিতে না পারিয়া স্থির করে—মামলার বিচার এখনও হয় নাই। কাজেই তাহারা আদালত-প্রাঙ্গণ ছাড়িতে অসম্মত হয় ও তথায় দাঁড়াইয়া জয়ধ্বনি করিতে থাকে। তাহাদের কয়জন নেতাকে উপরে লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি লইয়া মামলা স্থগিত রাখার আদেশপত্র দেখাইলে তবে জনতা শান্ত হয়।

জনতাকে ছত্রভঙ্গ হইতে নারাজ দেখিয়া আদালতের একজন পেস্কার আসিয়া নিজের উপবীত স্পর্শ করিয়া সকলের নিকট ঘোষণা করেন যে, দেশবন্ধুর মামলা হইয়া গিয়াছে। লোক তাহাতেও নিবৃত্ত হয় নাই।

এ দিকে যখন খুব গোলমাল চলিতেছিল, তখন বেলু নামক একজন সিভিল গার্ড জনতাকে বন্দুক দেখাইয়া সরাইয়া দিতে গিয়াছিল। তখনই পুলিশ তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। জনতার মধ্য হইতে তখন এক ১৫ বৎসরের উড়িয়া বালক তাহার পিস্তলের সম্মুখে বুক পাতিয়া দেয়। তাহার দেখাদেখি বহুলোক তাহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে। তাহার নাম বদন পণ্ডা। অপর একটি লোক দেশীয় খ্রীষ্টান, তাহার নাম আই, মণ্ডল। উহারা উভয়ে পুলিশের নিকট বলিয়াছে যে, উক্ত সিভিল গার্ড সকলের বুকের নিকট বন্দুক দেখাইয়াছিল। উক্ত সিভিল গার্ডকে হেয়ার ষ্ট্রীট থানায় লইয়া যাওয়া হইলে উহার নিকট হইতে কতকগুলি টোটা পাওয়া গিয়াছিল। থানায় পুলিশের ডেপুটী কমিশনার কিড ও কিসার উপস্থিত হইয়া নিম্নলিখিত কয়েকজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন —(১) সত্যেন্দ্রকুমার ঘোষ, (২) সুনীতি রায় চৌধুরী, (৩) অক্ষয়পদ ভট্টাচার্য্য, (৪) অক্ষয়কুমার দে, (৫) ব্রজেন্দ্র সেন ও (৬) বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমোক্ত তিনজন পুলিশ-আদালতের উকীল।

কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট

নাগপুর কংগ্রেসে সহযোগিতা-বর্জ্জন নীতি গৃহীত হইবার পর দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ভিন্নাকার ধারণ করে। সরকার ও কংগ্রেস অনুশাসিত জনসঙ্ঘের মধ্যে মনোমালিন্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। পরে সে অবস্থাকে সরকার ও অন্যান্য লোক সঙ্কটসঙ্কুল বলিয়া মনে করিতে থাকেন। এই ঘোর সঙ্কটসঙ্কুল সময়ে—কংগ্রেসের জীবনমরণের দিনে আমেদাবাদের কংগ্রেসে কে নেতৃপদে বৃত হইবেন, তাহা লইয়া সকল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীই চিন্তিত হইয়াছিলেন।

কিন্তু চিন্তার কারণ রহিল না। বাঙ্গালার চিত্তরঞ্জন নিখিল ভারতের চিত্ত হরণ করিলেন। তাঁহার অদ্ভুত ত্যাগের মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে প্রাদেশিক কমিটীগণ কর্ত্তৃক চিত্তরঞ্জন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় মহাসম্মেলনের সভাপতির গৌরবময় পদে বরিত হইলেন। তাঁহার দেশবন্ধু নাম সার্থক হইল; দেশের সঙ্কটকালে দেশবন্ধু না হইলে কে দেশের-সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় সভায় নেতৃত্ব করিবার অধিকারী?

কিন্তু বিধিলিপি অন্যরূপ। আমলাতন্ত্র সরকারের বিবেচনায় দেশবন্ধু আইন-বৈরী হইলেন, গ্রেপ্তার হইয়া হাজতে রহিলেন। এ দিকে যথাসময়ে আমেদাবাদে কংগ্রেস বসিল। দেশবন্ধুর পদ শূন্য রহিল না। প্রথমে কথা উঠিয়াছিল, উপযুক্ত স্বামীর যোগ্যা সহধর্ম্মিণী দেশবন্ধুর প্রতিকৃতির পার্শ্বে বসিয়া সভাপতির কার্য্য পরিচালনা করিবেন। কিন্তু বাসন্তী দেবী এই সময়ে বাঙ্গালার অসম্পূর্ণ কার্য্য ত্যাগ করিয়া আমেদাবাদ যাইতে চাহেন নাই, ননদী উর্ম্মিলা দেবীকে পাঠাইয়াছিলেন। দিল্লীর বিখ্যাত জন-নায়ক হাকিম আজমল খাঁ সর্ব্বসম্মতিক্রমে দেশবন্ধুর শূন্য আসন অধিকার করিলেন।

কিন্তু দেশবন্ধুর দেহ জেলের মধ্যে থাকিলেও তাঁহার আত্মা সেই সুদূর আমেদাবাদের মাতৃযজ্ঞে চলিয়া গিয়াছিল। দেশ-প্রেমিকা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু যখন তাঁহার বাণী সেই মহাযজ্ঞের আসরে সুষ্ঠু সুললিত উচ্চারণে পাঠ করেন, তখন দেশবাসী দেশবন্ধুকে সেখানে সশরীরেই পাইয়াছিল।

দেশবন্ধুর বাণী

কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু দেশবন্ধু শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশের অভিভাষণের অংশ-বিশেষ পাঠ করেন। তাহাতে মিঃ দাশ বলিয়াছেন যে, অসহযোগই তাঁহাদিগের যুদ্ধাস্ত্র। এ বিষয়ে তিনি মিঃ ষ্টোকসের কথা উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন, ন্যায়ের সহিত

যাহার কোনরূপ সামঞ্জস্য নাই,সেরূপ অবস্থার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে অস্বীকার করার নামই অসহযোগ। কাজেই, যাহারা অন্যায় করিতে চায় অথবা অন্যায়ের প্রতীকার করিতে অসম্মত, তাহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করিতে অসম্মত হওয়ার নামও অসহযোগ। অসহযোগ অস্বীকার হওয়ার নীতি, কিন্তু ইহার সার মর্ম্মে মোটের উপর একটি বিষয়ে স্বীকার হওয়ার কথাও রহিয়াছে। অসহযোগ আশা-ভরসার মন্ত্র, ইহার সাফল্য সম্বন্ধে অগাধ বিশ্বাস রাখিবারই কথা। অসহযোগীরা যে ইতিমধ্যেই সাফল্য লাভ করিয়াছেন, তাহা জেলের যাত্রীদের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায়। আলিভ্রাতারা যে অসহযোগ আন্দোলনের জন্য এত কষ্ট করিলেন, তাহা কি ব্যর্থই হইবে। পঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপৎ রায় যে ব্যুরোক্রেশীর আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া জেলে গেলেন, তাহা কি ব্যর্থ হইতে পারে? পণ্ডিত শ্রীযুত মতিলাল নেহেরু যে ঐশ্বর্য্যের সিংহাসন অগ্রাহ্য করিয়া স্বেচ্ছায় কারাবরণ করিলেন, তাহাতেও কি সুফল ফলিবে না? ছাত্রসমাজই দেশের আশা-ভরসা গৌরবস্থল। এই অসহযোগ আন্দোলনের পশ্চাতে তাঁহাদের উৎসাহ আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে,তাঁহারা আত্মোৎসর্গ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, জয় লাভ তাঁহারাই করিবেন।

নবম পরিচ্ছেদ

দেশবন্ধুর অপঠিত অভিভাষণ

কারাগারের হাজতে নিক্ষিপ্ত হইবার পূর্ব্বেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসের জন্য অভিভাষণ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। নিম্নে সেই অভিভাষণের সার মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম :—

আমাদের উপায়

আমি কেবল তিনটি উপায়ের কথা জানি ;—(১) অস্ত্র-শস্ত্র-সাহায্যে বাধাপ্রদান; (২) নূতন সংস্কার-আইন অনুসারে গঠিত কাউন্সিলগুলিতে ব্যুরোক্রেসীর সহিত সহযোগিতা ও (৩) অত্যাচার-বর্জ্জিত সহযোগিতা বর্জ্জন। প্রথমটি সম্ভব নহে বলিয়া আমি সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাহি না। যদি তাহা সম্ভব হইত, আমি তাহা সমর্থন করিতাম না ; আমি অত্যাচারবর্জ্জন নীতিরই পক্ষপাতী। কাজেই এখন অবশিষ্ট দুইটি উপায় আমাদের আলোচ্য—সহযোগিতা ও অসহযোগিতা।

যাঁহারা বর্ত্তমান সংস্কার-আইনের পক্ষপাতী, তাঁহাদের কয়টি কথার আলোচনা আমি করিব। স্বতন্ত্র অস্তিত্বরূপে ভারতের উন্নতি করিবার ও ভারতের ভবিষ্যৎ সমুজ্জল করার পক্ষে ভারতবাসীর যে অধিকার আছে, তাহা কি সংস্কার-আইনে স্বীকার করা হইয়াছে? সাধারণকে দায়িত্বপূর্ণ গভর্ণমেণ্ট দিবার কোন আভাস কি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই আইনে সূচিত হইয়াছে? ভারতের রাজকোষের উপর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার কি কোনওরূপ হাত আছে?

ঐ আইনের ভূমিকা হইতেই আইনের সারমর্ম্ম বুঝা যায়। ভূমিকায়

প্রথমেই লেখা—"যেহেতু, ইহা পার্লামেণ্টের গৃহীত নীতি"—এই গৃহীত নীতি কি? দায়িত্বপূর্ণ শাসন-প্রথায় যে ভারতীয়গণের জন্মগত অধিকার রহিয়াছে, তাহা স্বীকার করা? কখনই নহে। যে সব বাক্যে ভারতীয়গণকে অধিকার দেওয়ার কথা রহিয়াছে, তাহাদের অদ্ভুত সতর্কতা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আর ঐ আইনের ভূমিকায় কি এমন কথা আছে, যদ্দারা পার্লামেণ্টকে ভারতের ন্যায্য অধিকারের কথা স্বীকার করাইতে বাধ্য করান যায়? আমার বিশ্বাস, এরূপ কিছুই নাই। সমস্ত কথাই অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক এবং ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ চিরকাল আপনাদের ইচ্ছামত অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবে।

তাহার পর ক্রমে ক্রমে ঐ সকল অধিকার দেওয়ার কাল ও ধারা নির্ব্বাচন করিবার ভারও পার্লামেণ্টের উপর নির্ভর করে। আর একটি কথা। আইনের সর্ব্বত্র বলা হইয়াছে, "ভারতীয়" জাতি সমূহ "জাতি" নহে। অর্থাৎ ইহা দ্বারা পার্লামেণ্ট ভারতীয়গণকে একটা অখণ্ড জাতিরূপে স্বীকার করিতে চাহে না। বাস্তবিক ইহা দ্বারা ও অন্যান্য কথায় ভারতীয়গণের প্রতি যে অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করা হইয়াছে, আমি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতে বাধ্য। আমরা ভারতীয় জাতির (জাতির সমূহের নহে) কল্যাণ ও উন্নতির ভার লইতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। একটা বিদেশী পার্লামেণ্ট যে একটি অধীন জাতির প্রতি কর্ত্তব্য পূর্ণভাবে পালন করিতে পারে, ইহা আমরা আদৌ স্বীকার করি না। আমার বিশ্বাস, ঐ আইনের মূল উদ্দেশ্য, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের প্রাধান্য চিরকাল অক্ষুণ্ণ রাখা। কিন্তু এ অবস্থা আমরা কখনই স্বীকার করিতে পারি না। ঐ আইনের দুই এক স্থানে স্পষ্ট ভয় দেখান হইয়াছে। বলা হইয়াছে, যদি আমরা ভাল হইয়া থাকি, এবং আমাদের দায়িত্ব-জ্ঞানের পরিচয় দিয়া ব্রিটিশ পার্লামেণ্টকে সন্তুষ্ট করিতে পারি, তবে ভবিষ্যতে আমাদিগকে আরও নূতন অধিকার দেওয়া হইবে কি না, তাহা ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। অর্থাৎ সোজা কথা বলিতে গেলে তাঁহাদের

মতে আমরা চিরকেলে শিশু এবং পার্লামেণ্ট আমাদের চিরকেলে অভিভাবক।

আমার রাজনীতিক-প্রতিদ্বন্দ্বিগণের মতের উপর আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু যে মূলনীতির উপর সংস্কার আইন প্রতিষ্ঠিত, তাহা আমি গ্রহণ করিতে পারি না। আমাদের উন্নতির সোপান যাহাই হউক না কেন, আমার মতে সর্ব্বপ্রযত্নে আমাদের আত্মসম্মান রক্ষা করা কর্ত্তব্য। আমার মতে প্রকাশ্য কংগ্রেসে আমাদের ঘোষণা করা উচিত যে, স্বাধীনতা প্রত্যেক জাতির জন্মগত অধিকার—ভারতবাসীরও স্বীয় মুক্তি ও স্বাতন্ত্র্য গঠন করিবার পূর্ণ অধিকার আছে। এ বিষয়ে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট আমাদের অনুকূলে কি প্রতিকূলে যাহা স্থির করুক না কেন, তাহাতে কিছু আইসে যায় না। আমার মতে আমাদের স্পষ্টভাবে স্বীকার করা উচিত যে, যে জাতি যে কোন প্রকারে ভারতের আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও আত্মোন্নতির পথে বাধা প্রদান করিবে, সে ভারতের শত্রু, এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর উচিত, তাহাকে প্রতিরোধ করা। আমি কেবলমাত্র একটি সর্ত্তে ইংলণ্ডের সহিত সহযোগিতা করিতে রাজি আছি। সেটি এই—ইংলণ্ড ভারতবাসীর জন্মগত অধিকার স্বীকার করিবে। এই স্বীকৃতির কথা ভারত-সংস্কার আইনের কোথাও নাই। ভারতে বৃটিশ-প্রাধান্য চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকুক, এ কল্পনা অন্ততঃ আমি কখনও সহ্য করিতে পারি না।

আমার মডারেট বন্ধুগণ বলেন যে, আমি যে ভাবে স্বাধীনতা শব্দটির অর্থ বুঝি, যদিও ভারত-সংস্কার আইনে ভারতবাসীর সেরূপ স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় নাই, তথাপি যদি আমরা সংস্কার আইন ভালভাবে পালন করিতে পারি, তবে পার্লামেণ্ট আমাদিগকে স্বাধীনতা দিতে অস্বীকার করিতে পারিবে না। আমি আমার বন্ধুবর্গের স্বদেশ-প্রেমে সন্দেহ করি না, কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, এ কথার সহিত মূল কথার কোন সম্পর্ক নাই। স্বাধীনতা আমার জন্মগত অধিকার, খণ্ড খণ্ড করিয়া

বা আংশিকভাবে সে অধিকার স্বীকার করিলে চলিবে না। আমি চাই সে অধিকার সম্পূর্ণ অখণ্ড ও পূরাপূরি ভাবে স্বীকার করাইতে। জয় আমাদের পক্ষে,এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, আমাদের পরাজয় হইবে, তথাপি আমরা তো আত্মসম্মান ও আত্ম-গৌরব রক্ষা করিতে পারিব। ভারতসংস্কার আইনে আমাদের যে অপমান করা হইয়াছে,তাহার তো প্রতীকার করা হইবে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রে-সের দৃষ্টি তাঁহাদের চরম উদ্দেশ্যের প্রতি দৃঢ়নিবদ্ধ আছে; যাহাতে ভার-তীয় জন-সাধারণের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় না, এমন কোন কিছু তাঁহারা গ্রাহ্য করিবেন না। পক্ষান্তরে, নূতন মন্ত্রীদের দৃষ্টি তাঁহাদের স্ব স্ব বিভাগের উপর। সেই সেই বিভাগের কাজ ভাল করিয়া চালাইয়াই তাঁহারা স্বাধীনতা পাইতে চান। উভয় দলের মধ্যে পার্থক্য এই-খানে।

বাঙ্গালার মডারেটদের ধারণা, বাঙ্গালা-সরকারের সাত জন সদস্যের মধ্যে পাঁচজন ভারতবাসী। এ ধারণাটি ভুল। রিজার্ভ বিষয়গুলি সম্পর্কে দেশের শাসন-কার্য্য সপারিষদ গভর্ণর নির্ব্বাহ করেন, আর, হস্তান্তরিত বিষয় সম্পর্কে শাসন-ব্যাপার গভর্ণর মন্ত্রীদের সাহায্যে চালাইয়া থাকেন। কাউন্সিলের সদস্য, মন্ত্রিবর্গ ও গভর্ণর—সকলের এক সঙ্গে বসিয়া যুক্তি-পরামর্শ করিয়া শাসন-কার্য্য চালাইবার কোন ব্যবস্থা নাই। টেক্স, ঋণ-গ্রহণ ও ব্যয়ের ব্যবস্থা সম্বন্ধেই কেবল একযোগে ব্যবস্থা করিবার কথা আছে। রিজার্ভ বিষয়গুলিই অধিক প্রয়োজনীয়। জাতির হিসাবে ও আমাদের রাজনীতিক স্বাধীনতালাভের সংগ্রামের পক্ষে ঐ বিষয়গুলির বিশেষ আবশ্যকতা। সে বিষয়গুলিতে মন্ত্রীদের কোন হাত নাই। গভর্ণমেণ্ট ও আমাদের মধ্যে যে যুদ্ধ চলিতেছে, মন্ত্রীরা তাহাতে শুধু দর্শকমাত্র; এ সব সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা তাঁহা-দের নাই। তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের অংশরূপে বিবেচিত হন না। মহাত্মা গন্ধীকে গ্রেপ্তার করা হইবে কি না, এ সম্বন্ধে বিচার করিবার সময়

গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের মতামত জিজ্ঞাসা করিবেন না। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, রিজার্ভ বিষয়গুলিতে ভারতীয় সদস্যরা কিছু করিয়া উঠিতে পারেন না। গভর্ণর ও তাঁহার ইংরেজ সদস্যরা অন্যরূপ বিবেচনা করিলে ভারতীয়রা তাহার একটুও রদবদল করিতে পারেন না।

মন্ত্রীদের হাতে কোন বিষয়ের ভার দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই আমি মনে করি না। কতকগুলি বিষয় হস্তান্তরিত করা হইয়াছে বটে, শত বৎসরের ব্যুরোক্রেশীর শাসনে সে বিভাগগুলিতে অসুবিধাও যথেষ্ট। ঐ সব অসুবিধা দূর করিবার কোন ক্ষমতা মন্ত্রীদের হাতে নাই। মন্ত্রীদের নিজেদের বিভাগের কর্ম্মচারীদের উপর কোন হাত নাই, তিনি তাঁহার কর্ম্মচারী-নিয়োগের ব্যাপারে কোনও কাজ করিতে পারেন না। ভারতে ব্যুরোক্রেটিক শাসনের মজা এই যে,যখনই জনসাধারণ কোন প্রয়োজনীয় জিনিষ চাহিয়াছে, তখনই সরকার ব্যয়-বাহুল্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মন্ত্রীরা আবশ্যকমত ব্যয়-সংক্ষেপ করিয়া অল্পব্যয়সাধ্য উপায়ে নিজ নিজ বিভাগের কাজ চালাইতে পারেন না। সংস্কার আইনে সে ব্যবস্থা নাই। অথচ, বলা হইতেছে যে, ঐ বিভাগটির পরিচালনভার ভারতবাসীদের হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছে। অবস্থা অনুযায়ী আবশ্যক ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতাও তাঁহার নাই। টাকার থলি রাজস্ব-বিভাগের মন্ত্রীর হাতে, আমাদের মন্ত্রীরা কেবল আমাদের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন মাত্র।

ব্যবস্থাপক সভারই কি দেশে রাজকোষের উপর কোন হাত আছে? সে দিন একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আক্ষেপ করিয়া বিলাতের মহাসভার মন্ত্রীদের সহিত ভারতের মন্ত্রীদের যে তুলনা করিয়াছেন, তাহা হইতেই ব্যবস্থাপক সভার অবস্থা বুঝা যায়। নিয়ম আছে, বজেটের সময় শাসন-পরিষদের সদস্যরা ও মন্ত্রীরা মিলিয়া ব্যয়ের প্রস্তাব স্থির করিবেন। কিন্তু উভয় দলে মতের বিরোধ ঘটিলে গভর্ণমেণ্ট সকল গোলযোগ মিটাইয়া দিবেন। তাহা হইলে মন্ত্রীদের অবস্থাটা দাঁড়াইল কিরূপ? ভারতীয়

মন্ত্রীরা সংখ্যায় অধিক বলিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে বজেট স্থির হয় না। সংস্কার-আইন ভারতীয় মন্ত্রীদের উপর বিশ্বাসের পরিচয় দেয় না। শাসন-পরিষদ বলিতে পারেন না, আমরা এ ভাবে ও এত টাকা অমুক বিভাগের জন্য ব্যয় করিব। কোন বরাদ্দে অমত জানাইবার অথবা বরাদ্দের টাকা কমাইবার অধিকার তাঁহাদের আছে বটে, কিন্তু রিজার্ভ বিষয় সম্বন্ধে ওরূপ আপত্তি করিলে গভর্ণর তাহা নাকচ করিয়া দিতে পারেন। মডারেটরা ইহাকেই যথেষ্ট কর্তৃত্ব বলিয়া স্বীকার করেন। হস্তান্তরিত বিষয়গুলিতে কাউন্সিলের যে সামান্য ক্ষমতা আছে,. তাহাকে কি যথেষ্ট বলা যায়?

শাসন-ব্যাপারেও মন্ত্রীদের অবস্থা ভাল নহে। কোনও বিষয়ে মত-দ্বৈধ ঘটিলে গভর্ণর মন্ত্রীর কথা বাতিল করিয়া সেই বিভাগের সরকারী কর্ম্মচারীর মত গ্রহণ করিতে পারেন। হস্তান্তরিত বিষয়ে কোন নূতন ব্যবস্থা করিতে হইলে শেষ মতামত গৃহীত হইবে রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রীর। কারণ, এমন কোন ব্যবস্থা হইতে পারে না, যাহার সহিত রাজস্বের সম্পর্ক নাই।

সংস্কার আইন সম্বন্ধে মোটামুটি আর একটা কথা এই বলা যাইতে পারে যে, যে কোন সুসভ্য দেশের প্রত্যেক প্রজা যে অধিকার ভোগ করিয়া থাকে, ভারতীয় প্রজার সেই সাধারণ অধিকার পাইবার ব্যবস্থা কি এই আইনে আছে? সংস্কার-আইনে কি দেশবাসীর মতামত না লইয়া চণ্ডনীতির প্রবর্ত্তন অসম্ভব হইয়াছে? যে চণ্ডনীতি ভারতের শাসনের কলঙ্ক, সংস্কার আইন কি তাহার তিরোভাবের কোন ক্ষমতা দেশবাসীকে দিয়াছে? পঞ্জাব অনা-চারের পুনরভিনয় কি অসম্ভব হইয়াছে? এ সব সম্বন্ধে আমাদের অবস্থা ঠিক পূর্ব্বেরই মত।

মন্ত্রীরা এই শাসন-সংস্কার ব্যবস্থা অনুসারে কাজ করিতেছেন। আর মডারেটরা জোর গলায় বলিতেছেন, ইহাই স্বরাজের পূর্ব্বাভাস। আমি

ঐ সংস্কার-ব্যবস্থাকে সরকারের সহিত সহযোগিতা করিবার ভিত্তি বলিয়া মনে করি না। আমি আত্মসম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া শান্তি লাভ করিতে চাহি না। যে পর্য্যন্ত সংস্কার-ব্যবস্থা এইরূপ থাকিবে এবং আমাদের অধিকার—আমাদের নিজেদের কাজ নিজেরা চালাইয়া লইবার, আমাদের উন্নতির ব্যবস্থা আমাদের করিয়া লইবার অধিকার স্বীকৃত না হইবে, সে পর্য্যন্ত আমি আপোষের কথা কহিতে সম্মত হইতে পারি না।

আমাদের যুদ্ধ করিবার শেষ পথ হইতেছে অসহযোগ। আমরা দুইটি পর পর কংগ্রেসে এই অসহযোগ আন্দোলন করাই স্থির করিয়াছি। আমরা সকলেই অসহযোগনীতি গ্রহণ করিয়াছি, কাজেই আপনাদের নিকট ইহার অর্থ ব্যাখ্যা করার কোন প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু এই-খানেই ভারতের কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের কথা আমাকে বাধা প্রদান করিতেছে। তিনি বলিয়াছেন—"পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, আমরা কি অতিথি-সৎকারে বিমুখ হইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিব, না আমরা স্বীকার করিয়া লইব যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার মিলনেই জগতের মুক্তি হইবে?" আমি স্বীকার করি যে, ভারতের জাতীয়তার জীবনরক্ষা করিতে হইলে অন্য জাতির নিকট হইতে উহাকে পৃথক্ করিয়া রাখা চলিবে না। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা প্রসঙ্গে আমার দুইটি কথা বলিবার আছে, প্রথম—অতিথিকে সমাদর করিতে যাইবার পূর্ব্বে আমাদের নিজেদের একটি গৃহ স্থির করিয়া লইতে হইবে। দ্বিতীয়—পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ভারত যেন নিজেকে চিনিয়া লইতে পারে। আমার মত এই যে, স্বাধীনতা পাইবার পূর্ব্বে ভারত পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুকরণ করিতে পারে, কিন্তু তাহা সত্য গ্রহণ করিতে পারে না। ভারত শিক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ জিত হইয়াছে—রাজনৈতিক জয়ের ফলেই ইহা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নিকট আমি পরামর্শ দিতেছি যে, ভারতীয় সভ্যতা ভারতের অন্তরে যেন পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে।

জাতীয় জীবনের স্পন্দন হওয়া চাই, তখনই আমরা দুইটি সভ্যতার মিলনের কথা কহিতে পারিব।

তবে যাঁহারা বন্ধুভাবে আমাদের কথার সমালোচনা করিবেন, আমরা যথাশক্তি চেষ্টা করিয়া তাঁহাদের সন্দেহ দূর করিব। তাঁহারা বলেন যে, অসহযোগ নীতি, 'না' মন্ত্রের নীতি, 'হাতাশা' মন্ত্রের নীতি। এই নীতিতে যে সঙ্কীর্ণ ও পার্থক্য আছে, তাহা দেখিয়া তাঁহারা স্তম্ভিত হইয়াছেন। জগতের রাজনৈতিক আন্দোলনের স্রোত আজ যে দিকে চলিতেছে, অনেকে সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,কোন জাতি আজ একাকী থাকিতে চাহিলে তাঁহারা বাঁচিয়া থাকিতে পারিবেন কি না। আমাদের বন্ধু সমালোচকগণ আমাদিগকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমরা সেগুলির উত্তর দিতে বাধ্য। তাহা করিতে হইলে আমি নিজেই প্রশ্ন করিব—"অসহযোগ কি?" 'অসহযোগ কি' তাহা একবার বিবেচনা করিলেই 'অসহযোগ' কি, তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারিব। অসহযোগ একাকী একার বা অন্য হইতে পৃথক্ থাকার নীতি সমর্থন করে না। ইংরাজ শুধু ইংরাজ বলিয়াই অসহযোগ তাহাদের সহিত সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করে না! অবিচার ও অন্যায়ের শক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে ভগবান্‌কে ভুলিলে আমাদের চলিবে না। রবীন্দ্রনাথের কথায় তিনি "জাতি বা বর্ণের পার্থক্যের বাহিরে, প্রত্যেক মানব ও জাতির যথার্থ প্রয়োজনের পূরণ করিবার জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেন।" মানবতার উন্নতি-বিধানের জন্য প্রচারকার্য্য জগতের সমস্ত শক্তির সহিত যোগদান করিবার পূর্ব্বে আমাদের নিজেদের অন্ততঃ আত্মতৃপ্তি ও আত্মোন্নতি-বিধান করা প্রয়োজন। জাতি হিসাবে আমরা নিজেদের যথার্থ উন্নতি-বিধান করিতে না পারিলে আমরা মানবতার জন্য কোন কার্য্য-সাধন করিবার আশা করিতে পারি না। এই কথা একটু বিবেচনা করা যাউক। আমাদের দর্শনে আছে যে, সকল পার্থক্যের মধ্যেও একতা আছে, এই সকল বৈচিত্র্যের মধ্য

দিয়াই ভগবানের লীলা প্রকাশ পাইতেছে। সেই ভগবানের সত্তা সকলের নিকট-প্রকাশ করিবার জন্য এই সকল বৈচিত্র্যকে মিলিত করাই মানবের এই চেষ্টার প্রধান উদ্দেশ্য। ভগবানের লীলার প্রয়োজন এই যে, প্রত্যেক প্রকাশই বাধা না পাইয়া বড় হওয়া চাই। জগতের প্রত্যেক জাতিই এই প্রকাশ প্রতিবিম্বিত করে। বাগানের বিভিন্ন ফুলের মত জাতি তাহার আপন বিধি অনুসরণ করিবে এবং নিজের ভাগ্য নিজে গড়িয়া তুলিবে, তাহার ফলেই শেষকালে তাহারা প্রত্যেকে এবং সকলে মানবতার শিক্ষা ও জীবনের উন্নতিতে কিছু না কিছু দিতে পারিবে। মানবতার সেবা করিতে হইলে, একতা লাভ করিতে হইলে, আমাদের জাতি অন্য সকল জাতি হইতে যে স্থানে নিজেকে পৃথক্ করিয়াছে, যাহা আমি জাতির বিশেষত্ব বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি, তাহার উন্নতিতে বাধা দিলে চলিবে না। জাতীয়তার নীতির মূল কথাই এই এবং ইহার জন্য মানুষ জীবন পণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে। জাতি হইতে পৃথক্ এবং বিশেষভাবে মনুষ্যত্বের বিকাশই জাতীয়তা নহে, সমগ্র মানবতার আত্মোন্নতি, আত্মসিদ্ধি ও আত্মতৃপ্তিই যথার্থ জাতীয়তা। জাতীয়তা দ্বারাই মানব-সমাজ নিজেকে সম্পূর্ণ করিতে পারে, নিজেকে স্থির করিতে পারে ও যথার্থ নিজেকে চিনিতে পারে। কাজেই অসহযোগ নীতি ইংরাজকে শুধু ইংরাজ বলিয়া ত্যাগ করিতে পারে না. যে কোন জাতি ভারতের বিশেষত্ব নষ্ট করে বা আত্মসিদ্ধিতে বাধা দেয়, তাহার সহিতই অসহযোগ করিতে বাধ্য। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে শুধু পাশ্চাত্য বলিয়াই অসহযোগ ত্যাগ করে না। মন দিয়া গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে যে ত্যাগ ও প্রয়োজন, অসহযোগ তাহা মানিয়া লইয়াছে। জাতীয় শিক্ষালাভের জন্য আগ্রহ বিদেশী শিক্ষার প্রতিরোধী নহে; পোলাণ্ডে তাহা ছিল না, আয়র্লণ্ডেও তাহা ছিল না, ভারতেও তাহা নাই। ভারতের উপর বিদেশী সভ্যতার চাপ দূর করাই ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য। রাজনৈতিকই হউক বা শিক্ষাবিষয়কই হউক, পরাধীনতা কেহ সহ্য করিতে পারে না। ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়

যে, রাজনৈতিক পরাধীনতা আসিলেই সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতাবিষয়ক পরাধীনতা আসিয়া পড়ে। অতীতের সহিত আমাদের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য এবং আমাদের অন্তরে আমাদের নিজেদের দেশের সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই এই জাতীয় শিক্ষার ইচ্ছা আসিয়াছে। আমরা যে নীতি প্রচার করিতেছি, তাহা বাহিরের আলোকের আগমনে বাধা প্রদান করে না। যাঁহারা আমাদের কথা শুনিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আমরা এই কথাটি বলিতে চাই—"নিজের গৃহে যে দীপটি অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে, আগে তাহা জ্বালাও। অতীতের দিকে চাহিয়া দেখ, এবং অতীতের সহিত তুলনা করিয়া তোমার বর্ত্তমান অবস্থা উপলব্ধি কর। তাহার পর সাহসের সহিত জগতের সম্মুখীন হও এবং বাহির হইতে যে আলোক আসিবে, তাহা গ্রহণ কর।"

তাহা হইলে অসহযোগ কি? মিঃ ষ্টোক্‌সের উক্তি উদ্ধৃত করা অপেক্ষা আমি কিছু ভাল কথা বলিতে পারিব না। যে অন্যায় বন্ধ করা অনুচিত, তাহার সম্পাদনে সহযোগ করিতে অসম্মতিই অসহযোগ। অবিচারে যোগদান বা উহাতে সম্মতি-প্রদানে অসম্মতিই অসহযোগ। যে অন্যায়ের প্রতীকার হইতে পারে, তাহাতে আপত্তি না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে অসম্মতি অথবা বিবেক যাহাকে অন্যায় বলিয়া বলে, এমন অবস্থায় আত্মসমর্পণ করিতে অসম্মতিই অসহযোগ। যাহারা নিজ স্বার্থ-রক্ষার জন্য অথবা কাজে সুবিধার অছিলায় অন্যায় অনুষ্ঠানে জেদ করে কিংবা অন্যায় প্রতীকারে অসম্মত হয়, তাহাদের সহিত একযোগে কাজ করিবার নামও অসহযোগ।

কেহ কেহ বলেন, অসহযোগ কেবল কতকগুলা "না"র মন্ত্র, হতাশার নীতি। অসহযোগ মন্ত্র ভাল করিয়া না বুঝিলে ঐরূপই বুঝায় বটে, কিন্তু আমি বলিতেছি, ইহার সার মর্ম্ম "হাঁ-তে"। আমরা ভাঙ্গিতেছি গড়িবার জন্য, ধ্বংস করিতেছি নূতন করিয়া সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত, আমরা অগ্রাহ্য করি, ভাল বিষয় গ্রহণ করিবার জন্য। মানুষের চেষ্টা

যন্ত্রের ধারাই এই অধীনতা। যদি অমঙ্গলের হেতু হয়, তাহা হইলে যে সব লোকের মারফতে আমাদের সে অবস্থা স্থায়ী করিবার চেষ্টা হয়, তাহাদের সহিত অসহযোগ করিতে আমরা নৈতিক হিসাবে বাধ্য নহি কি? ইহা "না-"র কথা বটে, কিন্তু ইহাতে আমাদের হাঁ-র কথাও রহিয়াছে; মুক্তির জন্য আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞার কথা ইহা হইতেও জানা যায়। ইহা হতাশার নীতিও নহে; অসহযোগের সাফল্য সম্বন্ধে ইহাতে যথেষ্ট আশার কথা আছে; ইহা আশা ও বিশ্বাসেরই নীতি। আমরা যে ইতিমধ্যেই সাফল্যলাভ করিয়াছি, তাহা জেলের যাত্রীদের মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে। সৎসাহসী ও জাগতিক ব্যাপারে অভিজ্ঞ মৌলানা মহম্মদ আলি ও মৌলানা সৌকৎ আলি বৃথা দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লয়েন নাই। পঞ্জাবকেশরী লালা লজপৎ রায় যে বুরোক্রেশীর আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া বীরবিক্রমে জেলে যাইলেন, তাহাও বৃথা নয়। পণ্ডিত শ্রীযুত মতিলাল নেহেরু অগাধ ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও ঐশ্বর্য্যকে অগ্রাহ্য করিয়া যে সকল প্রকার দুঃখযন্ত্রণার সম্ভাবনা সত্ত্বেও সরকারী আদেশ অগ্রাহ্য করিলেন, তাহাও বৃথা নয়। দেশমাতৃকার জন্য যে মহাপ্রাণ ব্যক্তি আত্মাহুতি দিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নাম করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু ছাত্রদের কথাটা ছাড়িয়া গেলে চলিবে না; তাহারাই আমাদের আশা-ভরসাস্থল ও দেশের গৌরব। রাজনীতিক জীবনের কেন্দ্রে থাকিয়াই তাহা লক্ষ্য করিবার সুযোগ আমি পাইয়াছি; ছাত্ররা যে আশ্চর্য্য সাহস ও অকৃত্রিম স্বদেশ-প্রেমের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার প্রমাণ আমি পাইয়াছি। এ আন্দোলনের পশ্চাতে তাহাদের প্রেরণা রহিয়াছে, স্বার্থত্যাগ তাহাদের, জয়লাভও তাহাদের। তাহারা অন্ধকার পথে আলোক দেখাইয়া চলিয়াছে; দুঃখ-কষ্ট-ভোগ যদি তাহাদের অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে জয়লাভের গৌরবও তাহাদের প্রাপ্য।

অসহযোগ আন্দোলন এই মূল নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। যাহারা

আমাদের উন্নতিকে—জাতিরূপে আমাদের আত্মবিকাশে বাধা দিবে, একনিষ্ঠতার সহিত তাহাদের সর্ব্বদা অগ্রাহ্য করা, তাহাদের কৃত অনিষ্টের প্রতি দৃষ্টি রাখা, (তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া নহে, অনিষ্টকে কেবল অনিষ্ট বলিয়া মনে করিয়া) ও সর্ব্বপ্রকার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে প্রস্তুত থাকাই—অসহযোগের মূল নীতি। আমাদের আদর্শ খুব মহান্ বটে, কিন্তু শীঘ্র স্বরাজের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে ইহাই একমাত্র উপায় যে, শাসন-যন্ত্র আমাদের উন্নতিতে ও জাতিরূপে আত্মবিকাশে বাধা দিবার জন্য নির্ম্মম ভাবে চলিতেছে, তাহাতে সাহায্য করিতে ক্ষান্ত হইলেই যে ঐ যন্ত্র তাহার নিজ প্রয়োজন বোধেই ঐ সব কার্য্য বন্ধ করিয়া দিবে, এ কথা সাধারণবুদ্ধির লোকেও বুঝিতে পারে। কেহ কেহ বলেন, সরকারের শাসন-যন্ত্র তাহার কাজ বন্ধ করিলেই বিশৃঙ্খলা ও প্রতিক্রিয়ার স্রোতে দেশ ভাসিয়া যাইবে। আমার মনে হয়, এ কথার উত্তর খুব সহজ। আমাদের শক্তি-প্রয়োগের ব্যবস্থা যথাযথভাবে করিতে না পারিলে আমাদের এই অসহযোগ আন্দোলনে সাহায্যলাভ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। আন্দোলনের মূল নীতিই সমগ্র জাতির পক্ষে বুঝা দরকার। যদি তাহারা তাহা না বুঝে, তাহা হইলে আমাদের প্রতিপক্ষের আশঙ্কার কারণই উপস্থিত হইতে পারে না, আর, আমাদের আন্দোলনও সফল হইতে পারে না। যদি সকলে অসহযোগ নীতি বুঝে, তাহা হইলে সেই নীতির বলেই দেশে রাজদ্রোহ বা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিতে পারিবে না। তবে একটা কথা আমি অস্বীকার করিতে পারিতেছি না যে, সে দিন বোম্বায়ে একটা গোলযোগ হইয়া গিয়াছে। আমরা সেরূপ গোলযোগের দায়িত্ব অবশ্য লইব। বোম্বাইয়ে যে পরিমাণে অত্যাচার, ভয়-প্রদর্শন ও দমননীতির প্রয়োগ হইয়াছে, সে পরিমাণে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। এ কথা আমরা স্পষ্টই স্বীকার করিতেছি। কিন্তু এ অবস্থার প্রতীকারের উপায় কি? অসহযোগ মন্ত্র পরিত্যাগে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না; মন্ত্রের মর্ম্ম যাহাতে সকলে ঠিক ভাবে

বুঝিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করাই দরকার। প্রত্যেক বড় আন্দোলনেই রক্তারক্তি কাণ্ড ও বিশৃঙ্খলা দেখা যায়; এই খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের কথাই ধরা যাউক না। এ জন্য কি বলিতে হইবে যে, "নূতন আদর্শের" প্রচারে বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগের আশঙ্কা আছে বলিয়া পাদরীরা তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচারে বিরত থাকিবেন? পুরাতন আদর্শ ও পুরাতন জীবনযাপন প্রথার সহিত সংঘর্ষ ঘটিলেই বিশৃঙ্খলা অনিবার্য্য। ঐরূপ যুক্তির অবতারণা কেহ করিলে তাহার প্রতি কর্ণপাত করারও প্রয়োজন নাই আপনারা বলিতে পারেন, আমাদের এ আন্দোলনের নীতি এখনও দেশের জনসাধারণ বুঝিতে পারে নাই। আরও বলিতে পারেন যে, লোকে অসহযোগ নীতির মর্ম্ম না বুঝিলে সকলের একযোগে আইন অমান্য করায় বিপদ্ আছে। আপনারা এমন কথাও বলিতে পারেন যে, বোম্বাইয়ের গোলযোগ দেখিয়া আমাদের ব্যবস্থা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করা উচিত। কিন্তু গোলযোগ ঘটিয়াছে বলিয়া অসহযোগের মূল সত্যের বিরুদ্ধে তর্ক করার কোন সার্থকতা নাই। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতীকার করিতে আমাদিগকে সাহসের সহিত অগ্রসর হইতে হইবে, যাহাতে গোলযোগ না হয়, তাহার প্রতীকারোপায়ও আমাদের স্থির করিতে হইবে।

শেষ কথা

চিত্তরঞ্জন দেশবন্ধুরূপে দেশের কাজে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। রাজরোষ তাঁহার উপর আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি দণ্ডিত হউন বা নাই হউন, আমাদের লক্ষ্য করিবার কথা এই, তাঁহার জীবনাদর্শে আমরা কি শিক্ষা পাইলাম। পরার্থে ত্যাগ এ দেশের নূতন আদর্শ নহে। কিন্তু দেশের নিমিত্ত সর্ব্বস্বত্যাগের দৃষ্টান্ত এ দেশে বিরল। জাতীয় জাগরণের দিনে এ আদর্শ দেশবাসী হৃদয়ে ধারণ করিয়া ধন্য হইবে সন্দেহ নাই। আর চিত্তরঞ্জন দেশকর্ম্মীর কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাও

দেশবাসীর হৃদয়ে ধারণ করিবার জিনিস। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রসম্মেলনের সভাপতিরূপে চিত্তরঞ্জন একটি কথা বলিয়াছিলেন। সেইটি আমাদের সব চেয়ে বড় বলিয়া মনে হয়। কথাটি এই :—

"মোটা কাপড় যদি আমাদের কটিতে ব্যথা দেয়, সেই বেদনা আমাদের অকাতরে আপনার ও দেশের কল্যাণের জন্য সহ্য করিতে হইবে। এই বিলাস-বর্জ্জনে যে সংযম আবশ্যক, সেই সংযমের সাধন করিতে হইবে এবং আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, ভদ্রলোকের ঘরে যাহা আবদ্ধ হইবে, চাষীর ঘরে তাহা অল্পদিনের মধ্যেই প্রচার হইয়া পড়িবে।"

আমরা যদি যথার্থ স্বরাজকামী হই, যদি যথার্থ দেশকে ও জাতিকে দারিদ্র্য-মুক্ত ও স্বাবলম্বী করিতে আগ্রহান্বিত হই, যদি আমরা দেশের শক্তিসঞ্চয় করিয়া স্বরাজের পথে অগ্রসর হইতে অভিলাষী হই,—তাহা হইলে দেশবন্ধুর এই কথা কয়টি আমাদের মনে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত করিয়া রাখিতে হইবে। তাঁহার আর সকল কথা ভুলিয়া গেলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু এই কয়টি কথা যে মুক্তিকামী ভারতবাসীর মুক্তির সোপান, এ কথা ভুলিলে চলিবে না। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রও প্রথমে 'চরকায় স্বরাজ-লাভের' কথা পাগলের প্রলাপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, কিন্তু আজ তিনিও চরকার মস্ত গোঁড়া, আজ তাঁহার স্বগ্রাম রাড়লি-কাটি-পাড়ার ঘরে ঘরে তিনিই চরকা যোগাইতেছেন ; চালাইতেছেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বোম্বাইয়ের মালবীয় বৈঠক হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর মহাত্মা গন্ধীকে inspired prophet ঐশী শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। এমন লোক কি দেশকে চরকা গ্রহণ করিতে বলিয়া প্রলাপোক্তি করিয়াছেন? তাঁহারই বাণী দেশবন্ধু দেশবাসীকে দিয়াছেন। দেশের জন্য যিনি সর্ব্বস্ব দান করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন, সেই দেশবন্ধুর কথা বাঙ্গালা কি উপেক্ষা করিবে? এ কথায় হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, ক্রোধ নাই, বিপ্লব নাই, বিদ্রোহ নাই, কেবল দেশের নষ্ট শিল্প-বাণিজ্যের

পুনরুদ্ধারের কথা আছে, দেশে স্বাবলম্বনবৃত্তি জাগাইবার কথা আছে, মানুষ হইবার কথা আছে। চিত্তরঞ্জনের এ আহ্বান কি উপেক্ষিত হইবে?

আজ বাঙ্গালায় এক মানুষের মধ্য হইতে প্রকৃত মনুষ্যত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালী সে মানুষের সব কথা না শুনিলেও তাঁহার মনুষ্যত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহারই নিদর্শনস্বরূপ দেশবাসীরই লিখিত চিত্তরঞ্জনের প্রতি একটি প্রাণের কথা উদ্ধৃত করিয়া এই ক্ষুদ্র সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা সাঙ্গ করিতেছি :—

"চিত্ত! তোমার গরবে আজিকে চিত্ত ভরিয়ে যায়
তুমি ধন্য করেছ বঙ্গমাতায়, (তব) গৌরব-মহিমায়।
হে সাধু! হে কবি!
আজি মহাভারতের অন্তর-মাঝে জাগিছে তোমার ছবি
ত্যাগে নহে শুধু সাধনায় তুমি হয়েছ ভারত-রবি।
তুমি বড় ছিলে তা তো জানি
কিন্তু এত বড় এতখানি
আগে কে জানিত এত বড় তব প্রাণ,
হে সাধক, হে মহান্, হে মহীয়ান্!
আজি বহিছে চক্ষে ধারা
তুমি বরিতে চলেছ কারা;
বন্ধনে আজ কত যে মুক্তি দেখাতে আগুয়ান।
উঠুক অহিংসা মন্ত্রের গান
জগৎ ব্যাপিয়া উঠুক তাহার তান
বিনা রুধিরেই সার্থক হোক স্বরাজের অভিযান।"

পরিশিষ্ট

স্বরাজের স্বরূপ

চিত্তরঞ্জন স্বয়ং স্বরাজের স্বরূপ যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা তাঁহার সংবাদ-পত্র "বাংলার কথায়" মাঝে মাঝে প্রকাশ করিয়াছেন। দেশবাসীর উহা জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য মনে করিয়া নিম্নে কয়েকটি লেখা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ;—

(১)

"যে শুধু মুখে জয়ধ্বনি করে, যার অন্তরে স্বরাজের বেদনা জাগে নাই, যার অন্তর স্বরাজের ভাবে ভেজে নাই, সে কি স্বরাজ চাইতে পারে? স্বরাজ পাওয়া কি যেমন তেমন? * * * স্বরাজ, বিনা চেষ্টায়, বিনা সাধনায় গাছের ফলের মত পড়বে না। সেই সাধনা এখনই সফল করতে হবে। যদি না ক'রে থাকেন, যদি সেই সাধনায় সিদ্ধ হওয়ার জন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হয়ে থাকেন, তবে বলি, আপনাদের এ স্বরাজ চাওয়া মিথ্যা কথা—এ প্রাণের চাওয়া নয়। * * * যখন দেখব, আপনাদের এই চাওয়াটা অশান্ত পাখীর মত পাখা ঝাপটাতে থাকবে, তখনই বুঝব, আপনারা বাস্তবিক স্বরাজ চান। * * * বাঙ্গলা দেশের কৃষক, তারা স্বরাজের মর্ম্ম বুঝে, তারা স্বরাজ চায়। বাঙ্গলা দেশের অনেক জায়গায় গিয়ে তা বুঝেছি। * * * মিথ্যা তর্ক, শাস্ত্রের যত আবর্জ্জনা দূর ক'রে যখন তোমরা বলতে পারবে, আমরা স্বাধীন, তখন এক মুহূর্ত্তে স্বাধীন হবে। একবার মনের মধ্যে বল, আমরা স্বাধীন!! যদি তোমার মনের মধ্যে নিজের কিছু না থাকে, যদি বিদেশীর নিকট তোমার প্রাণ ও মন বিলিয়ে দিয়ে থাক, তবে ভগবানের পায়ে কি দিবে? তোমার মন প্রাণ যে তোমার নয়। জষ্টিশ উডরফ

বলেছেন, 'This is the cultural conquest of the West.' আজ ইংরেজ শুধু বাহিরে নয়, আমাদের মনকেও জয় করেছে। তাই আমরা দাস অপেক্ষা আরো হীন দাস। আর এই গোলামখানায় হীনদাস তৈরী হচ্ছে। যে মনে প্রাণে স্বাধীন নয়, যে নিজের মনকে নিজের অধিকারে না আনতে পারে, তার বিধাতাকে দেবার কিছু থাকে না। সে তা বল্লে মিথ্যা কথা বলা হয়। স্বরাজের কথা ভাল ক'রে ভাব, মনের মধ্যে তোলাপাড়া কর, মিথ্যা যুক্তির প্রশ্রয় দিও না। * * * এসেছি আমি ভিক্ষা করতে—ভিক্ষা দাও। শুধু অর্থের ভিক্ষা নয়—প্রাণের ভিক্ষা নিতে এসেছি, প্রাণ চাই। প্রাণের স্রোতে দেশ ভেসে যাক। কি দিবে ভাই আমায়, তোমার ঐ ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি দাও। এস স্বরাজের জয়ধ্বনি হউক।"

২১শে আশ্বিন, বাংলার কথা, প্রথম ভাগ, ৩য় সংখ্যা।

(২)

"যাঁরা মনে করেন,স্বরাজ একটা শাসন-প্রণালী,তাঁরা এই তত্ত্ব বোঝেন না। তাঁরা জানেন না যে, স্বরাজ হ'লে তবে শাসনপ্রণালী-প্রতিষ্ঠা হয়। স্বরাজ আগে, শাসন-প্রণালী-প্রতিষ্ঠা পরে।

স্বরাজের অর্থ কি? স্বরাজের অর্থ—হিন্দু মুসলমান মিলে যে নবীন জাতি গড়ে উঠছে, তাদের শুদ্ধ মনের সম্মিলিত ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত যে জীবন-প্রণালী।

সে ইচ্ছা প্রকাশের উপায় কি? বাসনা প্রগাঢ় করা, ইচ্ছা-শক্তিকে সংযত করা, আকাঙ্ক্ষাকে দৃঢ় করা। যে দিন ভারতের নরনারী এক-কণ্ঠে বলতে পারবে স্বরাজ চাই, মুখের কথা নয়, কার্য্যে—স্বার্থত্যাগ ক'রে প্রমাণিত করবে স্বরাজ চাই—সেই মুহূর্ত্তে স্বরাজ তোমার আসবে, সেই মুহূর্ত্তে তুমি স্বরাজ উপলব্ধি করবে। তখন যত বড় পার্লিয়ামেণ্টই জগতে থাকুক না কেন—সকলকে তোমার স্বরাজ স্বীকার করতেই হবে।

এ পরিষ্কার কথা। কিন্তু গোলামীতে যাদের প্রাণ আবদ্ধ, তারা তা বুঝে না। তারা মনে করে, স্বরাজ একটা শাসন-প্রণালী। ভগবানের করুণা প্রার্থনা কর—হৃদয় পবিত্র কর, তবে বুঝবে, স্বরাজ কি ?

এই স্বরাজ কি ক'রে পাওয়া যায় ? বিজ্ঞ ব্যক্তিরা অনেক তর্ক করেন, অনেক হাসিঠাট্টাও শোনা যায়। যখন মহাত্মা গন্ধী প্রথম বলিয়াছিলেন যে, তিন মাসের মধ্যে এক কোটী টাকা চাই, ১ কোটী কংগ্রেসের সভ্য চাই, আর ২০ লক্ষ চরকা চাই—তখন অনেক হাসির রোল উঠেছিল, অনেক হাসি-মস্কারা শোনা গিয়াছিল, বহু জ্ঞানী বুদ্ধিমান্ লোকেরা বলেছিলেন—এরা বাতুল। * * * এখন সে সব তর্ক শেষ হয়ে গেছে—কারণ, টাকা উঠেছে। * * *

অনেকে বলেন—কৈ, স্বরাজ তো হ'ল না ? এই রকম মনের অবস্থা থেকে তর্ক অনেক আসবে। তর্কের ঢের উত্তর দিতে পারি। কিন্তু যে জেগে ঘুমায়, তাকে কি ক'রে জাগাই ? কোটী টাকা, কোটী লোক ও ২০ লক্ষ চরকা হলেই কি স্বরাজ হবে ? কেহ বলে নাই স্বরাজ হবে—স্বরাজের সিঁড়ি তৈয়ারী হবে। ধাপে ধাপে আমাদিগকে উঠতে হবে। প্রথম ধাপে উঠেই যদি কেহ বলেন, কৈ, দোতালায় তো এলাম না ? সেটা তোমার দোষ, না দোতালার দোষ ? আমাদের সব সিঁড়ি উঠতে হবে, তবে ত স্বরাজ। স্বরাজ পাওয়া কি ছেলেখেলা ?

বিদেশীবর্জ্জন ও স্বদেশীগ্রহণ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ নানারকম তর্ক তুলেছেন। কলের সঙ্গে কি আমরা যুঝে উঠতে পারবো ? * * * আমরা তো বল্‌ছি না যে, আমরা প্রতিযোগিতা কর্‌তে পার্‌বো। প্রতিযোগিতা কর্‌তেও চাই না। * * ওদের শত বৎসরের সাধনায় যা গড়ে উঠেছে—আমরা একদিনে তা কেমন ক'রে পারবো। ওটা ভারতবর্ষের পথ নয়—ভারতের সাধনা বিভিন্ন। * * * আমরা চাই আমাদের পুরাতনকে নূতনভাবে ফিরিয়া আন্‌তে। *** শুধু নিশ্চল হয়ে ব'সে থাকলে কি হবে ? শুধু যুক্তি তর্কে কি হবে ? বিশ্বাস চাই, কাজের ক্ষমতা চাই, শক্তি চা । এর

ভিতর প্রতিযোগিতার কথা নাই—আমরা প্রতিযোগিতা চাই না, চাই বিদেশীর হাত হ'তে মুক্তি পেতে—চাই অপবিত্রতা, মনুষ্যত্বহীনতার হাত হ'তে নিজেকে উদ্ধার করতে।

বিশ্বাস জাগাও, আত্মশক্তির উপর প্রত্যয় কর—তা হলেই যাহা এত অসম্ভব মনে করছ—তাহাই অবিলম্বে তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়বে।"

২৮শে অক্টোবর, বাংলার কথা, প্রথম ভাগ, ৫র্থ সংখ্যা।

(৩)

"স্বরাজ যে আসবেই, স্বরাজকে যে আসতেই হবে, সে বিশ্বাস হৃদয়ে জাগাও ; তার আগে ধ্যান-ধারণা কর—তার আগে মর্ম্মে মর্ম্মে বোঝ যে, যতদিন স্বার্থত্যাগ না করতে পার, ততদিন বিধাতার কৃপা অবতরণ করবে না। যে স্বার্থপর, তাকে বিধাতা কখনও কৃপা বর্ষণ করেন না—যে নিজেকে নিবেদন না করে, যে নিজেকে উৎসর্গ না করে, যে জাতির উদ্ধারের জন্য সকল কষ্ট সহ্য না করে—মৃত্যু পর্য্যন্ত হাসিমুখে বরণ না করে, সে জাতির স্বরাজ উদ্ধার বিড়ম্বনা মাত্র। স্বরাজ যদি চাও,ছাড় বৃথা তর্ক, জাগাও সে বিশ্বাস—জাগাও ভগবানের উপর বিশ্বাস—ভাব যে, পৃথিবীর সমস্ত জাতির যেমন একটা অধিকার আছে, একটা কর্ত্তব্য আছে, একটা ধর্ম্ম আছে, একটা স্বভাব আছে—এই ভারতবর্ষের নবীন জাতি, এরও একটা অধিকার আছে, একটা কর্ত্তব্য আছে, একটা প্রকৃতি আছে, একটা স্বভাব আছে—তাকে উপলব্ধি কর। যে দিন এটা উপলব্ধি করবে—যে শুভ মুহূর্ত্তে ভারতের নরনারী সে স্বরাজকে—নিজের অন্তরের যে স্বরাজ—সেই স্বরাজকে উপলব্ধি করবে, সে মুহূর্ত্তে শুধু ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কেন, জগতের সকল জাতি সে স্বরাজকে স্বীকার করবে—স্বীকার করতেই হইবে। তাই বলছি,স্বরাজ হ'লে তার পর শাসন প্রণালী (System of Goverment) ; তখন এই নবীন জাতি যা চাইবে পাবে,গণ তন্ত্র চাও,গণতন্ত্র হবে। যত রকম শাসন-প্রণালী হ'তে পারে,তার

মধ্যে আমার মনের মধ্যে যেটা ভাল শাসন-প্রণালী ব'লে মনে হবে—তাই পাব। আমার মনে যে শাসন-প্রণালীর কথা জাগছে, সেটা কোন গণ-তন্ত্রের মত নয়—আজ পর্য্যন্ত যা দেখছি, তার মত নয়; কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের এই নবীন জাতির যে প্রকৃতি—আমাদের যা আদর্শ—আমাদের প্রতি গৃহস্থের জীবনে যার প্রমাণ পাওয়া যায়—যার সঙ্গে একটা প্রাণের সম্বন্ধ আছে ব'লে মনে হয়, তার সঙ্গে মিলবে। সুতরাং কি যে শাসন-প্রণালী হবে—কোন্‌খানে ক্ষমতা থাকবে, কার হাতে থাকবে, কটা পুলিশ থাকবে—সৈন্য থাকবে কি না অথবা পুলিশ থাকা উচিত কি না—এ সব কথা এখন ভাববার কি দরকার? আগে মন স্থির কর—আগে ভারতবর্ষের নরনারী এককণ্ঠে স্বরাজের মন্ত্র উচ্চারণ কর—তোমাদের ক্ষমতা উপলব্ধি কর; তার পর কটা পুলিশ থাকবে, কটা সৈন্য থাকবে, কটা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট থাকবে, তার আলোচনা হবে। এখন ও সব কথা যারা ভাবে, তারা স্বরাজ বিশ্বাস করে না—তারা বিশ্বাস করে বিলাতের ইতিহাস। তারা মনে করে, যেন এমন একটা সম্বন্ধ বিলাতের সঙ্গে ভারতের আছে—যাতে বিলাতের ইতিহাসের প্রবাহ অনুসারেই ভারতের ইতিহাস প্রবাহিত হয়ে চলবে, তাদের উন্নতি যে প্রকারে হয়েছে, আমাদের উন্নতিও ঠিক সেই প্রকারে হবে। তারা স্বরাজের কথা কি জানবে? চণ্ডিদাসের একটি গান আছে; আমি তাদের প্রতি সেই গানটি নিবেদন করবো—

'মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা
কাজ নাই সখি তাদের কথায়
বাহিরে রহুক তারা'।"

১৮ই নবেম্বর, বাংলার কথা, প্রথম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা।

(৪)

"যে দিন স্বরাজের জন্য, স্বাধীনতার জন্য সমস্ত ভারত জেগে উঠবে,

সেই দিন সেই মুহূর্ত্তে স্বরাজ, স্বাধীনতা তার হাতের মধ্যে এসে পড়বে তবে সে যোগ্যতা চাই, সে গভীর আকাঙ্ক্ষা চাই—মুখের কথায় নয়, কাগজে পত্রে লিখে নয়, সে আকুল যাতনা প্রাণে অনুভব করা চাই। সে তৃষ্ণার প্রমাণ কি? তার প্রমাণ ত্যাগ, দুঃখ-সহন।

আজ যদি আমি জিজ্ঞাসা করি, তোমরা স্বরাজ চাও—সবাই বলবে 'হাঁ।' কিন্তু কাজে তার প্রমাণ চাই। স্বার্থ বলিদান চাই—যে নিজকে নিবেদন করবে, স্বরাজের জন্য মরতে পর্য্যন্ত প্রস্তুত হবে, তাদের চাওয়ার উপরই স্বরাজ আসবে।

* * * * *

যারা জেলে যাবে, তারা কারা? তারা স্বরাজ চায়—স্বরাজ তাদের দিবসের ভাবনা, নিশীথের স্বপ্ন, তাদের জীবনের একমাত্র বস্তু।"

২রা ডিসেম্বর, ৯ম সংখ্যা।

(৫)

"স্বরাজ মানে কি? আর অসহযোগ মানেই বা কি? স্বরাজ মানে আর কিছু নয়,—স্বরাজের এমন অর্থ হয় না যে, পার্লামেণ্ট থেকে এক-খানা এ্যাক্ট তৈয়ারী ক'রে আমাদের উপহার দেবে। * * *

স্বরাজ মানে তোমার অন্তরে অন্তরে যে প্রকৃতি আছে, সে প্রকৃতিকে উপলব্ধি করা।

* * * * *

ইংরেজ বলতে পারে, গোলমালে কাজ কি, তোমরা স্বায়ত্তশাসন নাও। সেটা ত স্বরাজ নয়। সেটা তোমার উপার্জ্জন নয়, সাধনার ফল নয়। কেউ কি স্বরাজ দিতে পারে? তোমাকে অর্জ্জন করতে হবে; তোমাকে নিজের সাধনায় যা বাস্তবিক সত্য প্রকৃতি, সে সত্য প্রকৃতির সন্ধান ক'রে, তাকে বাহিরে উপস্থিত ক'রে জগতের সমক্ষে দাঁড় করাতে হবে, এই স্বরাজের অর্থ।

* * * * *

স্বরাজ তোমাকে চাইতে হইবেই; তোমার প্রকৃতির সন্ধান তুমি করবে না, তোমার প্রকৃতির সাধনা করবে কি ইংরেজ? কি লজ্জার কথা!"

৩০শে সেপ্টেম্বর, প্রথম সংখ্যা।

চিত্তরঞ্জন অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কেও যাহা বলিয়াছেন, তাহার কয়েকটি রচনা হইতে উদ্ধৃত হইল ;—

(১)

"আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, আমরা জনসাধারণকে শান্ত সংযত রাখিতে যে পরিমাণে অসমর্থ হইব—তা তাহারা গুণ্ডাই হউক আর যেই হউক—আমাদের অসহযোগব্রতও সেই পরিমাণে নিষ্ফল। দায়িত্ব সবই আমাদের।"

৯ই ডিসেম্বর। ১০ম সংখ্যা।

(২)

"আমি প্রত্যেককে মনে রাখিতে ও বিশ্বাস করিতে বলি যে, আমাদের সিদ্ধি নির্ভর করিতেছে সম্পূর্ণরূপে শান্ত, সংযত ও উপদ্রব-বিহীন থাকিবার উপর।"

২৩শে ডিসেম্বর, ১২শ সংখ্যা।

সম্পাদিকা—বাসন্তী দেবী।

(৩)

"আজ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে প্রস্তুত যে, এই আন্দোলন, ইংরাজীতে যাহাকে রাজনীতি বলে, ইহা তাহার আন্দোলন নহে। ইহা প্রেমের আন্দোলন, ধর্মের আন্দোলন, আমাদের জাতীয় জীবনের স্পন্দন। এই আন্দোলনকে সফল করিবার একমাত্র উপায় আত্মনিবেদন—সকল শাস্তি, সকল আপদ-বিপদকে তুচ্ছ করিয়া প্রাণের অনুরাগে আত্মনিবেদন।"

১৩শ সংখ্যা।

(৪)

"ক্ষুদ্র স্বার্থ বলিদান দিয়া নিজের ধর্ম্মরক্ষার্থে আত্মার বল সংগ্রহ করিতে হইবে। বর্ত্তমান আন্দোলন সেই আত্মবল সংগ্রহের আয়োজন মাত্র।"

১৪শ সংখ্যা।

সম্পূর্ণ।

চিত্তরঞ্জনের কারাদণ্ড।

১৪ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার বাঙ্গালার জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে স্মরণীয় দিন। সে মঙ্গলবার যথার্থই বাঙ্গালীর পক্ষে মঙ্গলবার। কেন না, ঐ দিন বাঙ্গালার আদর্শ নেতা চিত্তরঞ্জন ত্যাগের জলন্ত নিদর্শন দেশবাসীর সমক্ষে ধারণ করিয়া কারাকষ্ট বরণ করিয়া লইলেন।

ঐ দিন দেশবন্ধুকে জেল হইতে ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটের পুলিস আদালতে আনয়ন করা হয়। দেশবন্ধুর বিচারের দিনে পূর্ব্বেও যেমন জনতা হইয়াছিল, এদিনও তেমনই হইয়াছিল। জনতা-ধীর, স্থির, প্রশান্ত, গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল।

দেশবন্ধু শান্ত অবিচলিত ভাবে কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান হইলেন। প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সুইনহো বিচারে বসিলেন। দেশবন্ধু সে বিচার-কার্য্যের প্রতি উদাসীনের ভাব ধারণ করিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি কিছু বলিতে চাহেন?"

দেশবন্ধু ধীর গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "না।"

তখন ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "আমি আপনাকে সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ ধারার ১ ও ২ সর্ত্তানুসারে ৬ মাসের অশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিতেছি।"

দেশবন্ধু দণ্ডের আদেশ শুনিবার পর কোনও কথা বলেন নাই। তাঁহাকে তৎপরে কাঠগড়া হইতে লইয়া যাওয়া হয়। ঐ দিনই মেদিনীপুরের কাঁথির জমিদার ব্যারিষ্টার দেশপ্রেমিক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ শাসমল মহাশয়েরও মামলার দিন ছিল। তাঁহারও ৬ মাস অশ্রম কারাদণ্ড হয়।

দেশের জনসাধারণের হৃদয়ের রাজা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও দেশ-কর্ম্মী বীরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের আদেশ আদালতের বাহিরে প্রচারিত হইবামাত্র জনসঙ্ঘ বিপুল হর্ষভরে তাঁহাদের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। এই জয়ধ্বনি যে তাঁহাদের বিরাট ত্যাগ-মহিমার উদ্দেশে উত্থিত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না।

চিত্তরঞ্জন ও বীরেন্দ্রনাথ—সর্ব্বতোভাবে অহিংস অসহযোগীর নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। যে চিত্তরঞ্জনের ত্যাগপুণ্যে অসহযোগ আন্দোলন পূত, বঙ্গদেশ গৌরবান্বিত, সেই চিত্তরঞ্জন অসাধারণ আইনজ্ঞান সম্পন্ন হইয়াও আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই, নির্ব্বিকার-চিত্তে জেলে গেলেন।

চিত্তরঞ্জনের ত্যাগের তুলনা এ বঙ্গদেশে বর্ত্তমান সময়ে পাওয়া যায় না। তিনি দেশ-সেবার পূত দীপ লইয়া যুগ-ব্যাপী জাড্যের অন্ধকারে—বিপদের কঙ্কর কণ্টকিত পথে পথিপ্রদর্শক হইয়াছিলেন। সেই ত্যাগের পুণ্যস্পর্শে বাঙ্গালায় স্বরাজ-সাধনায় অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সাফল্যের পথে অগ্রসর হইয়াছিল।

চিত্তরঞ্জনের এ ত্যাগের আদর্শ ব্যর্থ হইবার নহে। সে ত্যাগের আদর্শে বাঙ্গালী নব-বলে বলীয়ান্ হইয়াছে। বাঙ্গলার নব-জাগরণের ইতিহাসে ত্যাগী চিত্তরঞ্জনের নাম অক্ষয় অক্ষরে লিখিত থাকিবে।